KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৩ নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রমথ চৌধুরী
Title : সবুজপত্র (SABUJ PATRA)	Size : 7.5"X6"
Vol. & Number : 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12	Year of Publication : আশ্বিন ১৩২৫ কার্তিক ১৩২৫ অগ্রহায়ণ ১৩২৫ পৌষ ১৩২৫ মাঘ ১৩২৫ ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২৫ Condition : Brittle ✓ / Good
Editor : প্রমথ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

বন্ধু।

—:০:—

(১)

এক নতুন বন্ধু পেয়েছি। সে সকালে দুপুরে বিকেলে সন্ধ্যায় অষ্টপ্রহরই আমার ঘরে এসে বসে থাকে।

সকালে বলে—"আহা কি সুন্দর সকাল, কি শান্ত সময়টা, পাখী ও ছেলেদের কলরবে শুধু মুখরিত দিক্—এ সময়টা আমি তোমার বন্ধু এসেছি তোমার কাছে, আমার সৎকার কর, কোথাও যেও না, ঘুরে বেড়িও না। বোসো দিকিন ভাই, খাতাটি নাও দেখি, আসন করে বসে মনের ভিতর ডোবোত এবার?"

তাই যদি করি, তবে সকাল পেরোলে দেখি বন্ধু আমার স্নিগ্ধ হাস্যমুখ। নয়ত কোথা উধাও।

দুপুরে বলে—"আহা কেমন উদার ব্যাপক সময়টা। ঘুমুবে নাকি? তবে আমি চল্লুম।"—হেসে হেসে আকাশবিহারী আকাশে মিলিয়ে যেতে চায়।

যদি বলি—"না, ঘুমোব না, বল কি করি, কি করলে তোমায় কাছে রাখতে পারব।"

সে পাশে এসে হাতে হাতখানি রেখে বলে—"তবে এসো, এই জানালার ধারটাতে এসে বোসো। দেখ দিকি কেমন মাঠ—ঐ

মাঠের শেষে দিগন্তের পরপারে কত কি সম্ভাবনা, কত কি আশা, কত কি গান, কত কি সৌভাগ্য ঝিক্ ঝিক্ করছে। ঐ মরীচিকাকে ধরে ফেলে বাঁধতে পার না? ছবিতে, লেখায়, গানে, ভাবে জড়াও না?

সন্ধ্যে বেলায় বলে—"একটুখানি চুপ করে বসে থাক শুধু। আর কিছুই কোরোনা।"

(২)

স্বায়ত্ত সকালও আছে, দুপুরও আছে। বন্ধু কিন্তু আর আসে না। মাঠ ছেড়ে সহরে এসেছি। কাঠকাঠরা, আলমারি টেবিল চৌকির রাশল, বিছানা পত্তর, খাটের মাথায় গোটান মশারি, ছড়ান কাপড়, হোল্ড, টিফিন বাস্কেট, ট্রাঙ্ক, হ্যাণ্ডব্যাগ ও সাজগোজের নানা উপাদানে ঘর ভরা, চিকফেলা জানলার গায়ের ভিতরে একটুখানি আকাশের পট। বন্ধুর চরণ আর তাতে পড়ে না।

কে সে বন্ধু? আগে ভেবেছিলুম তার নাম বুঝি "সময়"; এখানে দেখছি "সময়" সেই আছে, কিন্তু বন্ধু নেই। তবে কি সে শুধু অবসর নয়, অবকাশ? মনের আর ঘরের, কালের স্থানের আর দুয়েরই? যেমন শূন্য মনে ভিন্ন বন্ধুর সমাগম হয় না, তেমনি নিরবচ্ছিন্ন স্থূলের ঠেসাঠেসিতেও বন্ধু স্ফূর্ত্তি পায় না?

(৩)

অনেক দিন আর সেরকম করে আকাশ সাঁৎরে বন্ধুকে আমার দিকে আসতে দেখি নে। কিন্তু আকাশের দিকে দৃষ্টি পড়লেই তাতে

যে তার আভাষ মাখান রয়েছে তার স্পর্শ পাই। যদি নীরবে বসে থাকি, যদি নিজের মাঝে ডুবি তবে বন্ধু আস্তে আস্তে অলক্ষ্যে এসে আবার জড়িয়ে ধরে। কে সে বন্ধু? কে সে সুজন, জনতা থেকে নিজেকে ছিনিয়ে আনলে যাকে পাওয়া যায়? সে কি আমার ভিতরের সম্পূর্ণতা?

(৪)

আমার কতক সময় আর আমার নেই। বাক্‌দত্ত করে ফেলেছি। পাছে তার কিছু ফেলাছড়া হয়, পরের জিনিষ হরণ করে ফেলি তাই ভয় হয়। তাই ভয়ে ভয়ে নাওয়া, ভয়ে খাওয়া। প্রতিশ্রুত সময়ে পদক্রান্তি না হয়। সময়ের বাক্যদান আত্মসাধনার জন্য কোন শরীরী বন্ধুকে। তা হতেই হঠাৎ চিন্‌লেম্ অশরীরী বন্ধু তোমার কবিং পুরাণং অনুশাসিতারং! তুমি আমার অন্তর্য্যামী!

(৫)

দহরাকাশে যে অন্তর্য্যামী, বহিরাকাশে সেই বিশ্বাত্মা। হৃদাকাশ যাঁর আসন, চিদাকাশ তাঁরই বসন। দিগম্বরের পরিধান সেই অম্বরের প্রতি, সেই শূন্য কহেন—আকাশের প্রতি, শূন্যের প্রতি মানবাত্মার তাই এত টান। মন্মনা ভব, মদ্ভক্তো, মদ্‌যাজী, মাং নমস্কুরু।

কিন্তু আত্মা বা বিশ্বাত্মাকে শূন্যভাবে সর্ব্বদা মনন করা যায় না, ধরা ছোঁয়া যায় না, ধরে রাখা যায় না। তাকে সূক্ষ্ম হতে যতই সূক্ষ্মতর হোক্ না কেন রূপের বা রেখার নির্দ্দিষ্টতার মধ্যে আনতে

পারলে মন যে আলম্বন পায় তাতে চরিতার্থতা দ্রুত পরিপাক লাভ করে। তাই গুরুর মাহাত্ম্য, অবতারের সার্থকতা।

"আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধু
বন্ধুরাত্মাত্মনোস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনাজিতঃ।"

আত্মাই আত্মার বন্ধু। যে আত্মচেষ্টায় আত্মজয় করে তারই আত্মা তার বন্ধু।

সেই ধ্রুব নিত্য বন্ধু কখন কখন অন্তর ছেড়ে মর্ত্যবন্ধু হয়ে বাহিরে দেখা দেয়। হে অশরীরি! তোমার মর্ম্মবাণী চর্ম্মের ভিতর দিয়ে ব্যক্ত হলে বুঝি শ্রেয় কর্ম্মে প্রবৃত্তি সহজ হয়? তাই অরূপ তুমি রূপধারী হও? যাকে অর্জ্জুন বলেছিলেন—

"শিষ্যস্তেঽহং সাধি মাং ত্বাং প্রপন্নং।"

জগতে দুটি ধারা প্রবাহিত। এক শাসনের বা প্রহরীগিরির, অন্যটি গ্রহণের বা প্রীতির। কৃষ্ণাবতারে এই দ্বিধারার সঙ্গম হয়েছিল। অনুশাসিতা যে সে কবি হওয়া চাই, রসিক হওয়া চাই, বন্ধু হওয়া চাই—শুধু গুরু নহে। তার নিকট থেকে আবদার চাই—

"আমায় সব সমর্পণ কর।"

আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মচেষ্টাদ্বারাই আত্মজয় করতে হবে। কিন্তু আত্মা যে ঘটে ঘটে বিরাজিত, তাই ঘটান্তরেও তাকে বন্ধুমূর্ত্তিতে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দ প্রবল। মানবাত্মা আপনাকে আপনার কাছে জমিয়ে রেখে তৃপ্ত নয়, সে আপনাকে দিতে চায়।

"আমারে কে নিবি ভাই সঁপিতে চাই আপনারে!"

মানবের মর্ম্মোত্থিত এ ক্রন্দনের নিবৃত্তির জন্য নেবার লোক চাই, দেবার পাত্র চাই যে কইতে পারে।

"যৎ করোসি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।"
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণং।

যাকে অর্পণ করবে, যার নিকট সব কিছু বাক্‌দত্ত হবে সে যদি সাম্‌নে এসে হাত বাড়িয়ে দাঁড়ায় তবে তন্মনা হয়ে, তদ্ভক্ত হয়ে তাকেও নমস্কার।

শ্রীসরলা দেবী।

উড়ো চিঠি।

—:*:—

ফেব্রুয়ারী ২৪, ১৯১৯।

অমর!

তুমি আমাকে একেবারে আশ্চর্য্য করে দিয়েছিলে। প্রায় সাড়ে চার মাস পর আজ সকাল দশ ঘটিকা এগার মিনিট বার সেকেণ্ডের সময় তোমার শ্রীহস্তের একখানি পত্র আমার এ দীনের কুটীরে এসে পৌঁচল—"তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম"।

যাহোক তোমার চিঠি পড়ে এতদিনের নীরবতার কারণ বুঝলুম। চিঠিখানায় আগা থেকে গোড়া পর্য্যন্ত একটা অভিমানের সুর ফুটে উঠেচে।

"ইউরোপ নিজের চেহারা দেখতে পেয়েচে বলে যে, সে রাত পোহালে গরুদের জোড় পরে টিকি রেখে ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমংপদম্ বলতে বসে যাবে তা নয়,"—আমার এ কথায় তুমি রাগ করেচ। আমাদের আচার ব্যবহার, ধর্ম্মানুষ্ঠান ইত্যাদি সম্বন্ধে অমন ironical মনের ভাব তুমি আমার কাছে থেকে আশা কর নি; লিখেচ, এতে তোমার অন্তরে একটা আঘাত লেগেচে। কিন্তু ও-কথা আমি ironically লিখি নি—অমন একটা apt allusion আমি আর কোথাও খুঁজে পেলুম না, তাই ওটা লিখেচ। ওটার মধ্যে একটা

সত্যের চেহারা দেখতে পাই বলেই ওটা অমন জায়গায় অমনি করে লিখেছিলুম। এতে তোমার বা আর কারো অভিমান করবার কি আছে জানি নে।

তুমি আমায় ঘোর materialist বলেছ,—আমার materialism নাকি আমার পত্রে ছত্রে ছত্রে ধরা পড়েছে। আমার চিঠিতে যে microscope দিয়ে materialism-এর সূক্ষ্ম পরমাণু কোথা থেকে বের করলে, তা বোঝা আমার বুদ্ধির অতীত। তোমার বিশ্বাস, আর শুধু তোমারই বা বলি কেন, আজকাল এ দেশের প্রায় সবারই বিশ্বাস, যে-কেউ এই জগৎটাকে ফাঁকি বলে উড়িয়ে না দেবে সেই অদার্শনিক, অধার্ম্মিক, অনাধ্যাত্মিক, আস্থরিক—সে দৃষ্টিহীন, জ্ঞান-হীন, বদ্ধ, রুদ্ধ, আসক্ত। এই যে অবস্থাটা দাঁড়িয়েচে আজ যদি সংস্কৃত আমাদের মাতৃভাষা থাকত তবে এই অবস্থাটা দাঁড়াতে পারত না বলেই আমার বিশ্বাস। কেননা তখন সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের একটা অতি সহজ সম্বন্ধ থাকত, তখন সংস্কৃত ভাষা আমাদের মুখে মুখে থাকত বলে আর তখন সেটাকে দেবভাষা আখ্যা দিতুম না; সুতরাং আমাদের আত্মার চাইতে পদে পদে তার একটা বড় মূল্য দিয়ে বসতুম না। যে-লোকটা লিখতে পড়তে জানে না বা অতি কম জানে তার কাছে যে ছাপার হরফের মূল্য কি, আর কতটা, তা ত সেই Scotch peasant-ই প্রমাণ করেছিল, যখন সে তার শেষ যুক্তি দাখিল করেএই বলে যে, I saw it in print. আমরা যখন সংস্কৃত সাহিত্য-মন্দিরে প্রবেশ করি, বিশেষত তার দর্শনের কোঠায়—তখন আমাদের মাথা ভয়ে ভক্তিতে অমনি নত হয়ে আসে, তারপর ঐ মাথা-নত অবস্থা এমনি অভ্যাস হয়ে যায়

যে যখন সে-মন্দির থেকে বেরিয়ে আসি তখনও আর ঘাড় সোজা হতে চায় না। কেবল যে সোজা হতেই চায় না, তাই নয়—সোজা হওয়াটাই তখন একটা মস্ত অ-ভক্ত হৃদয়ের পরিচয় হয়ে উঠে। কেবল তাই আমরা লক্ষ করা নিরানব্বুই হাজার ন'শ নিরানব্বুই জনা সংস্কৃত জানিনা বলে, জানলেও তা পড়বার ইচ্ছে বা অবসর হয় না বলে, আর ইচ্ছে আর অবসর হলেও কঠোপনিষদের বদলে ঋতুসংহারই খুলে বসি বলে, সে-কালের দার্শনিক মতগুলো একালে আমাদের কাছে বাজারে-গুজবের আকার ধারণ করে দেখা দিয়েচে। এই যেমন ধর—মায়াবাদ, এই মায়াবাদ যে আসলে কি তা আমিও জানি নে, তুমিও জান না—শঙ্করভাষ্য আমিও পড়ি নি, তুমিও পড় নি—ও রাম শ্যাম যদু কেউ-ই পড়ে নি—শঙ্করের আসল মায়া কি ছিল, তা কেউ জানে না। অথচ সকলের মুখেই মায়াবাদ। এবং যে আজ জন্মালে সেও বলচে জগৎটা মায়া, ও যে কাল মরবে সেও বলচে জগৎটা মায়া। গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী এসে বলচে জগৎটা মায়া, ভিক্ষে পাই গো। গৃহস্থ এসে বলচে—জগৎটা মায়া, চরণধূলি চাই গো। তিলককাটা বৈষ্ণব বলচে—জগৎটা মায়া, এস রাধাকৃষ্ণের নাম করি। রুদ্রাক্ষ-আঁটা তান্ত্রিক বলচে—জগৎটা মায়া, এস কারণ-বারি পান করি। এই যে বাজারে সস্তা মায়াবাদের বুলি, এই বুলি আওড়ানই যদি আধ্যাত্মিকতা হয়, এবং এই বুলি খেতে শুতে যেতে না আওড়ানোটাই যদি জড়বাদের লক্ষণ হয় তবে আমি যে জড়বাদী তার কোনো ভুল নেই। তবে spiritualism আর materialism-এর সংজ্ঞা ঠিক ঐ কি না সে সম্বন্ধে এমন একটা সন্দেহ আছে যে সন্দেহটা এই জগৎটা আছে কি নেই—এ সন্দেহের চাইতে সন্দেহজনক।

(২)

কিন্তু সে যাহোক, আমি তোমায় হলফ করে বলতে পারি যে আমি জড়বাদী নই, কেননা জড়ও যে চৈতন্যেরই বিকাশ এই আমারও বিশ্বাস। আমাদের এই গোঁড়ামীর দেশে যে এক রকম আধ্যাত্মিকতার গোঁড়ামী আছে সেই গোঁড়া আধ্যাত্মিকবাদীও আমি নই। আমার ঘাড়ে যদি নিতান্তই কোন বাদ চাপাতে চাও তবে যে-বাদটায় তোমার সঙ্গে আমার কোন বিবাদ বাধবে না সেটা হচ্চে লীলাবাদ। আমি ভগবানের লীলা মানি। আর এই লীলা মানি বলেই আমি জড়ও মানি চৈতন্যকেও মানি, অর্থাৎ—অন্নকেও মানি, আত্মাকেও মানি, ভোগকেও মানি, যোগকেও মানি—আলাদা আলাদা করে নয়, এক সঙ্গে। আমি যে Kipling নই, সে সম্বন্ধে তুমি স্থিরনিশ্চিত, সুতরাং—

"East is east and west is west
And never the twain shall meet."

এত বড় একটা কথা বলবার সাহস আমার নেই। আসলে অন্ন ও আত্মার মধ্যে বিরোধটাই আমার কাছে স্পষ্ট নয়, তার চাইতে ঢের বেশি স্পষ্ট তাদের মিলনের দিক এবং সেই দিকটাই হচ্চে মঙ্গলের দিক, কল্যাণের দিক। তুমি শুনে আশ্চর্য্য হবে কি না জানি নে, কিন্তু আমার ওই কথা সমর্থন করবার জন্যে আমি তোমায় উপনিষদ থেকে শ্লোক তুলে দেখিয়ে দিতে পারতুম। কিন্তু যা বাঙলায় বল্লুম তা যদি না মান, তাহলে সংস্কৃত শ্লোক তুল্লেই যে অমনি বুঝে যাবে—এ কথা মনে করা আসলে তোমার বুদ্ধির প্রতি কটাক্ষ করা

হয় ; কিন্তু আর যাই হোক সে কটাক্ষ তোমার বুদ্ধির প্রতি আমি করতে পারি নে। কিন্তু উপনিষদ থেকে এই যে-শ্লোক তুল্লুম না, সেই শ্লোকই প্রমাণ যে সেকালে ঋষিদের মধ্যেও কেউ কেউ ছিলেন যাঁরা কাঁধে পাখা লাগিয়ে দিবারাত্র আকাশে উড়ে বেড়াতেন না,—কেবল বায়ু সেবন করে'।

(৩)

আমাদের অতীত সম্বন্ধে আমার একটা মস্ত বড় আপত্তি কি জান ?—সেটা হচ্চে এই যে, তা এত ভীষণ লম্বা যে আমরা মেপে তার হিসেব করে উঠতে পারি নে।—আর যদি বা পারি তবু সে হিসেব মনে করে রাখতে পারি নে। ওর শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত আমাদের দৃষ্টি চলে না— মাঝপথ পর্য্যন্ত এসে তারপর হয় দৃষ্টি থেমে যায়, নয় ত ঝাপসা হয়ে আসে। যেখান পর্য্যন্ত এসে আমাদের দৃষ্টি থেমে যায় ঐ সেইটেই হচ্চে "অপ্রাচীন দার্শনিক যুগ"—যাকে ইতিহাসের ভাষায় বলা চলে আমাদের মধ্যযুগ। এ যুগে ভারতীয় চিন্তা-জগতে একটা বিশেষ ভাব ফুটে উঠেছিল এবং এই ভাবকে আশ্রয় করে একটা নতুন দর্শন গড়ে উঠল। এর van guard হচ্চেন বুদ্ধ, আর rear guard হচ্চেন শঙ্কর। আমরা আমাদের জাতীয় অতীতের লম্বা রাস্তায় ঠিক ঐ খানটায় পর্য্যন্ত দেখতে পাই বলে আমাদের আজ সবারই মনে মনে একটা অস্পষ্ট ধারণা স্পষ্ট হয়ে বসে গেছে, সে ধারণাটা হচ্চে এই যে, আবহমানকাল থেকে হিন্দুর ভারতে ছিল মাত্র দুটি জিনিষ—এক পর্ণকুটীর আর শীর্ণ ঋষি।

সে কালের ঋষিরা সবাই শীর্ণ ছিলেন কি না সে তর্ক না হয় না-ই তুল্লুম কিন্তু ঐ কারণেই আজ আমাদের চোখের সুমুখে নৈমিষারণ্যের বৃক্ষলতাগুল্ম এমনি নিবিড় হয়ে উঠেচে যে তা ভেদ করে ইন্দ্রপ্রস্থ হস্তিনাপুর রাজপ্রাসাদের উঁচু চূড়া একটুও দেখা যাচ্চে না, সৌতি সনকাদি ঋষির মুখে চাপ্‌দাড়ি এমনি কাল হয়ে উঠেচে যে পরীক্ষিৎ জনমেজয়ের মাথার সুবর্ণ মুকুট একটুও চোখে পড়চে না। তাই অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারতের একটি অক্ষরও আজ আমাদের মনে নেই, আর মনে থাকলেও তা অতি যত্ন করে মুখে আনি নে। কেন না মুখে আনলেই তার একটা যুক্তিপূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিতে দিতে জান হয়রান হয়ে যাবে। তার বদলে আজ আমরা আওড়াচ্চি—"মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা" অথচ যখন প্রশ্ন ওঠে আমাদের জাতির দুর্দ্দশা হল কেমন করে ? সোজা উত্তর—ধর্ম্মের অধঃপতন হয়েছে বলে। এখন জিজ্ঞেস কর—ধর্ম্মের অধঃপতনের অর্থ কি ?—তখন দেখবে পাঁচ জনের মধ্যে চার জনের সে সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণাই নেই, আর বাকি একজন এমনি উত্তর দেবে যাতে হাসির চোটে পিলে ফাটে। সেদিন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করেছিলুম—"আচ্ছা বলুন ত আমাদের ধর্ম্মের অধঃপতনের অর্থ কি ?" তিনি উত্তর দিলেন—"বাপুহে ধর্ম্মের অধঃপতনের আর বাকি কি, আজকাল ব্রাহ্মণরাও যখন রেলগাড়ী চাপচে।" ব্রাহ্মণ এমনি ভাবে আমার দিকে চাইতে লাগলেন যে, তাঁর ধর্ম্মের ব্যাখ্যাটা উপনিষদে স্থান পাবার যোগ্য। অথচ এটা কারো কাছেই শুনবে না যে, আমাদের যে ধর্ম্মের অধঃপতন হয়েচে এবং যার জন্যে এমন দুর্দ্দশা হয়েচে সেটা হচ্চে "মনুষ্যত্ব" ধর্ম্মের অভাব। আমাদের প্রথম

ধারণা যে মানুষ আসলে হচ্চে কচিখোকা, তাকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত শাসনে রাখতে হবে। আর আমাদের দ্বিতীয় ধারণা এই যে, মানুষ নামক জীবটি আসলেই কু, ভাষায় যাকে বলে হাড়পাজী। তাকে এতটুকু স্বাধীনতা দিয়েচ কি সে গিয়ে নরকের পথে নেমেচে, অর্থাৎ—মানুষের আসল সদিচ্ছাটাই হচ্চে তার নিজের ধ্বংস সাধন করা—এই আত্মহত্যা থেকে বাঁচাবার জন্যে আমাদের ঘরে বাইরে বন্দোবস্ত। বাইরে অস্ত্র আর ঘরে শাস্ত্র। শুনতে শুনতে আমাদের স্পষ্ট ধারণা হয়ে গেছে যে মানুষের আত্মঘাতী না হয়ে বেঁচে থাকবার একই উপায় আছে—সেটা হচ্চে পরবশ্যতা। এর পাল্লায় পড়েই মানুষের ধর্ম্মের বিকাশ হতে পারছে না, যে বিকাশ হচ্চে মানুষের আনন্দের ও স্বাধীনতার বিকাশ। অথচ আমাদের সবারই ধারণা যে আমাদের যা-কিছু দুঃখ, তা হচ্চে অক্ষয়তৃতীয়ার দিন যে বার্ত্তাকু ভক্ষণ নিষেধ সেটা মানি নে বলে। কিন্তু সবার চাইতে মজার কথা হচ্চে এই যে, আজ আমাদের নজর পরপুরুষের অস্ত্রের উপরে পড়েচে, কিন্তু পূর্ব্ব-পুরুষের শাস্ত্রের প্রতি আমাদের দৃষ্টি মোটেও পড়ে নি—ভিতরের বাঁধ-নই যে বড় বাঁধন—একথা আমরা চোখ মেলেও মানি নে। তারপর বিশেষত আমরা যখন আজ সবাই পলিটিক্যাল, তখন আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা একেবারেই দেশদ্রোহীতার পরিচায়ক। আমরা জাতিটা কি না আধ্যাত্মিক তাই বাইরে থেকে যা আমাদের চর্ম্মের উপরে এসে পড়েছে তাই আজ স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি কিন্তু ভিতর থেকে যা আমাদের মর্ম্মের উপরে পাথর চাপিয়ে রেখেচে তা আমাদের মোটেই চোখে পড়চে না। দিব্যদৃষ্টি আর কাকে বলে—বল?

(৪)

ধান ভানতে শিবের গীত এখানেই শেষ করা গেল। এখন শোন লীলাবাদ আমি মানি বলে মানুষ ও জগৎ সম্বন্ধে আমার ধারণা কি?

তুমি হাজার সাত্ত্বিক হলেও আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু তোমায় একটি কথা বলে রাখচি যে কেবল সাত্ত্বিকতাকে আশ্রয় করে একটা মানুষ বসে থাকতে পারে; কিন্তু একটা সমাজ বা জাতিকে গড়িয়ে বেড়াতে হবে। ইউরোপে যে এত Balance of power-এর কথা শোন, একটা কোনো সমাজের মঙ্গল চিরকাল ধরে রাখতে চাইলে সেই সমাজের মানুষদের মধ্যেও তেমনি একটা Balance of সত্ত্ব, রজ, তম চাই। এই কলিযুগের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম—ত্রেতায় যখন ধর্ম্ম ছিল এখনকার চাইতে তিনগুণ, তখনও কিন্তু বিশ্বামিত্রকে আসতে হয়েছিল দশরথের কাছে, রামলক্ষ্মণকে নিয়ে যেতে তাড়কাসুর বধ করবার জন্যে। ত্রেতাতেই যখন এই তখন কলিযুগের কথা অনুমান করেই নিতে পার। বায়ুপিত্ত কফের সামঞ্জ-স্যেই মানুষের দেহের স্বাস্থ্য—স্বত্ত্ব রজ তম—এই তিনের সামঞ্জস্যে সমাজদেহের মঙ্গল। খালি সাত্ত্বিকতায় দেহটা আত্মা হয়ে সমস্ত মানুষটা আকাশে মিলিয়ে যাবে, খালি তামসিকতায় আত্মাটা জড় হয়ে সমস্ত মানুষটা মাটিতে মিশিয়ে যাবে, এই দুর্ঘটনা থেকে বাঁচতে হলে, চাই এ দুয়ের মাঝে রজ। রজ দু'হাত দিয়ে দু' দিককার সত্ত্ব ও তমকে টেনে রাখবে। সত্ত্বকেও উড়তে দেবে না, তমকেও লুটতে দেবে না। তবেই মানুষ নামক জীবটির মঙ্গল—ভগবানের এই লীলার মাঝে। কিন্তু রজও যদি অতিরিক্ত প্রবল

হয়ে ওঠে তা হলেও ঘটবে আবার দুর্ঘটনা। রজটা হচ্চে আগুন—এই আগুণ যদি টু-হানড্রেড ডিগ্রী ফারেন্‌হিটে উঠে যায় তবে তৎক্ষণাৎ একদিকে আত্মাটা বাষ্প হয়ে যাবে, আর একদিকে দেহটা ভস্ম হয়ে ধ্বসে পড়বে। তিন গুণের এই তিন অমঙ্গল থেকে বাঁচতে হলে মানুষকে তার জীবনে এ তিনের একটা Balance (সামঞ্জস্য) স্থাপন করতে হবে। মানুষ তার ত্রি-গুণকে অতি সহজেই ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে সেই দিন, যেদিন সে প্রত্যক্ষ করতে পারবে যে সে তার প্রকৃতির দাস নয়—সে তার ঈশ্বর।

(৫)

তুমি এইখানে একটা কথা বলতে পার যে সত্ব ও রজকে না হয় মানলুম—কিন্তু তমর দরকারটা কি?—দরকার আছে। জান ত জাহাজের খোলে ballast পূরে দেয়—জাহাজের তলা ভারি রাখবার জন্যে। নইলে বাতাসের একটু জোরে আর ঢেউয়ের একটু তোড়ে জাহাজ এমনি হেলবে দুলবে যে, তাতে জাহাজের স্থৈর্য্য রক্ষা করা দায় হবে। তমটাও হচ্চে মানুষের প্রকৃতিতে ঐ ballast, এই তমের ভারেই মানুষ কোনো রকমে মাটীর উপর দাঁড়িয়ে থাকে। এ তম-এ যদি মানুষের তলা ভারি না থাকত তবে সে কোন্ দিন প্রসপেরোর এরিয়েল বা এঞ্জেল গেব্রিয়েলের মত পাখা মেলে আকাশে উধাও হয়ে যেত। এ তম আছে বলে সত্ব তাকে উড়িয়ে নিতে পারছে না, রজও তাকে পুড়িয়ে দিতে পারছে না।

অবশ্য যাঁরা মায়াবাদী বা নির্ব্বাণবাদী তাঁদের কাছে আমার এ মত উপস্থিত করাই ধৃষ্টতা। কেন না তাঁদের পক্ষে সমস্ত দেহটা

আত্মা হয়ে আকাশে মিলিয়ে গেলেই বা কি আর সমস্ত আত্মাটা দেহ হয়ে মাটিতে মিশিয়ে গেলেই বা কি—ও-দুয়ের একই ফল, অর্থাৎ—সমাধি। কিন্তু তুমি যদি লীলাবাদ মান তবে আমার কথাগুলো এক দৃষ্টিতেই পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে না দিয়ে একটু বিচার করে দেখবে কি?

(৬)

তোমাকে নিশ্চয়ই আজ আমাদের এই নব জাগরণের যুগে, যখন আমরা সবাই সময়ে অসময়ে কাজে অকাজে এমন কি বেকাজে পর্য্যন্ত গীতার শ্লোক আওড়াই তখন একথা নতুন করে জানিয়ে দিতে হবে না যে আমাদের দেহের চাইতে মন বড়, মনের চাইতে আত্মা বড়, অর্থাৎ—যা যত বেশি অদৃশ্য তা তত বেশি প্রধান। এ তিনের মধ্যে আত্মা জিনিষটা এত অদৃশ্য যে বিদ্যাপতির ভাষায় "লাখে না মিলিল এক", কে তার খোঁজ খবর পায়? সুতরাং ঐ আত্মার কথাটা ছেড়েই দেওয়া যাক। বাকি রইল দেহ ও মন, এ দুয়ের মধ্যে মন বড়। এখন আমাদের প্রত্যেকেরই, অর্থাৎ—যাঁরাই হিন্দুসমাজে বসবাস করছেন, তাঁদের এই মন নামক জিনিষটি interned হয়ে আছে। শাস্ত্রীয় বালুর চরে এই internment-এর camp, চারদিক সঙ্গীন কাঁধে শ্লোক-পুলিশ পাহারা দিচ্চে। এই internment ভেঙেছে কি, একেবারে সমাজ থেকে নির্ব্বাসন। এখন মনকে যদি দেহের চাইতে বড় বলে মান তবে দেহের internment-এর চাইতে মনের internment অবস্থা যে সাংঘাতিক একথা তোমাকে লজিকের খাতিরে মানতেই হবে। কিন্তু আমাদের মধ্যে হাজারে ন'শ নিরানব্বুই

জনার ওটা খেয়ালেই আসে না। তার কারণ মনের internment অবস্থা দর্শনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয় এবং ঠিক সেই জন্যেই ওটা বেশি মারাত্মক। কিন্তু আর যারই যাহোক, আমার নিজের সম্বন্ধে বলতে পারি যে জ্ঞান হওয়া থেকে মনের interned অবস্থা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছি।

উপরে আমি কেবল তোমার কাছে থিওরিই দাখিল করেছি সুতরাং তার ব্যাখ্যা দিতে আমি ন্যায়ত বাধ্য।

জন্ম থেকে আমাদের প্রত্যেকেরই জীবন যে কেমন ভাবে চালিত হয় তার রঙ্গ-রসহীন ইতিহাস এখানে তোমায় না হয় নাই দিলুম। উপরে যে থিওরি দাখিল করেছি, কেবল আমার জীবনের দুটি ঘটনা দিয়ে তার একটা ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করব। সেই যে দুটি ঘটনা তা সমাজের কাছে হয়ত অতি অকিঞ্চিৎকর, এমন কি নেহাৎ বাজে, কিন্তু আমার কাছে তার একটা বিশেষ মূল্য ছিল। এ দুটি ঘটনা ঘটলে সমাজের কোনো ক্ষতি হত না অথচ আমার পরম লাভ হত। এ দুটি ঘটনার কথাই তোমার জানা আছে। প্রথম আমি বিলেত যেতে চেয়ে ছিলুম আর দ্বিতীয়টি হচ্চে এই যে আমি তোমার ভগ্নিকে বিয়ে করতে চেয়েছিলুম। কিন্তু ওর প্রথমটি ঘটল না, কারণ পুজ্যপাদ তোতারাম স্মৃতিশিরোমণি মহাশয়—যাঁকে আমার দাদামশাই ইষ্টদেবতার মত দেখতেন—তিনি স্পষ্ট করে আমার ঠাকুরদা'কে শুনিয়ে বলেছিলেন যে নোনাজলের গন্ধ যার নাকে ঢোকে তার এদিকে ওদিকে অর্থাৎ—ঊর্দ্ধতম ও নিম্নতম গোণা-গাঁথা একশ' তিরাসি পুরুষের বুড়ো বুড়ী ছেলে মেয়ে আণ্ডাবাচ্চা সবা-রই নরকবাস নিশ্চয়। আর ওর দ্বিতীয়টি ঘটল না তার কারণ আমার

নাম শ্রীমান্ অশান্তকুমার "ভট্টাচার্য্য" আর তোমার বোনের নাম শ্রীমতী শান্তিলতা "গুপ্তা"। এর মানে হচ্চে এই যে, আমার মধ্যে মন বলে যে একটি জিনিষ আছে সেই মনের দুটি বিশেষ চিন্তা, দুটি heroic ইচ্ছা যার জন্যে আমি নিজে দায়ী, সেই দুটি চিন্তা কর্ম্মে অনূদিত হল না বাইরের চাপে, সমাজের চাপে। মন বিরক্ত হয়ে বললে—এই ত তোমার সমাজ, এখানে কুম্ভকর্ণের মত নিদ্রা দেওয়াই প্রশস্ত, এখানে চিন্তা করতে যাওয়াই ঝকমারি, এখানে মন যদি জাগে, মন যদি সংকীর্ণ জায়গা থেকে একটুকু ফুটে ওঠে অমনি চারদিক থেকে সমাজ তাকে চাপতে থাকে। এমন অবস্থায় মন বেচারী কি করে, সে ঘুমিয়ে পড়ল, মন যখন ঘুমিয়ে পড়ল তখন জীবন বললে—মন যখন ঘুমল তখন আমি আর জেগে থেকে কি করব। তখন সে চোখ বুঁজে দিব্যি লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। চারদিকে বাইরে কত না হৈ চৈ কত না হাসিকান্না রাগ! চোখ-বোঁজা জীবনের কাছে সে সব স্বপ্নের মত এসে পৌঁচতে লাগল।

কিন্তু সে যাহোক এইখানে বাঙালীজাতি আজ যে অবস্থায় এসে পৌঁচেছে সে-অবস্থায় যে শ্রীমান্ ভট্ট ও শ্রীমতী চট্টোর বিয়ের, সঙ্গে শ্রীমান্ "ভট্ট" ও শ্রীমতী "গুপ্তা"র বিয়ের, কি মানসিক কি নৈ-তিক কি আধ্যাত্মিক কি সামাজিক কি ব্যবহারিক কোনো দিক থেকে একটুকুও প্রভেদ নেই কিম্বা আমি বিলেত গেলেই যে সমস্ত ভারত মহাদেশটা ভারত মহাসাগরের নীচে তলিয়ে যেত না—এসম্বন্ধে আমি তোমাকে লম্বা বক্তৃতা শুনিয়ে দিতে পারতুম, যে বক্তৃতাতে স্বপক্ষ বিপক্ষ দুয়েরই রক্ত গরম হয়ে উঠত; কিন্তু আমার এ ক্ষুদ্র চিঠির পৃষ্ঠা ত তোমার গোলদীঘিও নয়, গড়ের মাঠও নয়। সুতরাং

অসাধারণ শৌর্য্যে সে-লোভ সম্বরণ করে ঐ যে দুটি ইচ্ছা আমার সম্পাদন হল না তার ভিতরের দিকটার একটা কথা তোমায় বলব।

এইখানে আমি তোমার কাছে স্পষ্ট করে কবুল চাচ্চি যে, আমি বিলেত গেলেই যে আমার সুমুখে শক্ত দুটো শিং বা পিছনে লম্বা একটা লেজ গজিয়ে যেত বা তোমার বোনকে বিয়ে করলেই যে হোমরুল ফলটা—যা আজ ভীষণভাবে ডানে বাঁয়ে দুলছে, তা টক্ করে বোঁটা ছিঁড়ে আমাদের একেবারে নাকের ডগার উপরে এসে পড়ত, তা নয়। কিন্তু ঐ যে দুটি মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সমাজ দাঁড়ালে—এই ঘটনাটার পিছনে একটা principle আছে, যেটা সমাজের পক্ষে মারাত্মক। এই principle-টা হচ্চে এই যে, সমাজ তার প্রত্যেক সভ্যদের বলচে—দেখ তোমাদের ভাবতে হবে না, চিন্তা করতে হবে না, কোন বিষয়ে ইচ্ছা করতে হবে না। আমি আছি, আমার বাঁধা নিয়মের পাকা সড়ক দিয়ে চলে যাও, তাতেই তোমার মোক্ষ।

এই বন্দোবস্তে প্রথমত মানুষ নামক জীবটি ব্যর্থ হয়ে উঠচে, কেন না মানুষ ত কল নয়। তার মন আছে, বুদ্ধি আছে, কল্পনা আছে, ইচ্ছা আছে, Will আছে—কিন্তু সমাজ মানুষের এই সকলের মুক্তগতি দিতে নারাজ। সমাজ বলচে—মানুষ তোমার মন চাই নে, বুদ্ধি চাই নে, কল্পনা চাই নে, ইচ্ছা চাই নে, Will চাই নে—চাই তোমার স্মরণশক্তি, চাই তোমার মুখস্ত করবার বিদ্যে। এই রকম করে সমাজ যখন তার সভ্যদের কেবল হুকুম তামিল করবার যন্ত্র করেই তুলচে—এর শেষ কুফলটা আবার গিয়ে সমাজের বুকেই বাজচে।

সমাজ নামক জিনিষটিকে যদি বিশ্লেষণ কর তবে দেখবে যে, সমাজ প্রাণবস্তু, সমাজ শক্তিমান। আসলে সমাজ আর যাই হোক বহুব্রীহি সমাস নয়। সমাজ প্রত্যেক সভ্যের কাছ থেকেই তার শক্তি সামর্থ্য জ্ঞান ইত্যাদি আহরণ করছে। সুতরাং যখন সমাজের সকল সভ্যই, কি মনের দিক থেকে কি চিন্তার দিক থেকে কি কল্পনার দিক থেকে কি শক্তির দিক থেকে, একেবারে শূন্য; তখন সমাজ তাদের কাছ থেকে কেবল শূন্যই লাভ করতে পারে। আসলে জড়জগতে ও মনোজগতে একটা প্রভেদ আছে। দশখানা কব্জি একত্র করলে তা বাঁশের মত মোটা ও শক্ত হ'য়ে উঠতে পারে কিন্তু দশজন বোকাকে একত্র করলে একজন স্যর অ্যাইজ্যাক নিউটন হ'য়ে উঠে না।

সুতরাং চাই ব্যক্তিগত মানুষের মুক্তি—তার চিন্তার মুক্তি, কর্ম্মের মুক্তি—এই মুক্তির ভিতরে যে প্রত্যেক মানুষের স্বাধীনতা, সেই স্বাধীনতার আনন্দে প্রত্যেক মানুষটি তার সমাজকে আনন্দময় করে তুলবে, তার প্রাণের গতিতে মনের কল্পনায় বুদ্ধির দৃষ্টিতে সমাজকে পূর্ণ করে তুলবে—তখনই আমরা দেখতে পাব সমাজ-দেবতা একটা কাঠের পুতুল নয় বা East End Co-র দম দেওয়া ঘড়ি নয়—সে দৃষ্টিবান, জ্ঞানবান ও শক্তিমান। এই দৃষ্টির ভিতর দিয়ে সমাজ সত্যকে পাবে, জ্ঞানের ভিতর দিয়ে প্রেমকে পাবে ও শক্তির ভিতর দিয়ে সম্পদ ও গৌরবকে লাভ করবে।

লিখতে লিখতে চিঠি প্রকাণ্ড হ'য়ে গেল। সময়ও যায়। কাজেই এখানেই দাঁড়ি টানলুম। কেন না তোমাকে আমি একটা

example set করতে চাই। সে example-টা হচ্চে এই যে, ভদ্রলোকের কাছ থেকে চিঠি পেয়ে তার উত্তর সাড়ে চার মাস দেরী না করে' সেই দিনই দেওয়া। ইতি—

তোমার চিরকেলে
অশান্ত।

শিল্পী।

—:০:—

শিল্পী ছবি আঁকত।

রাজার সেগুলো পছন্দ হ'ত না; সভাসদগণের মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠ্‌ত; নাগরিকেরা মুখ ফিরিয়ে চলে যেত।

শিল্পীর তবুও ছবি আকার বিরাম ছিল না।

* * * * *

কিন্তু এমন একদিন এল যখন শিল্পীর অনশন-ক্লিষ্ট হাত হ'তে তুলিকা আপনিই খ'সে প'ড়ল।

গৃহলক্ষ্মী ব'ললেন—রাজার কাছে যাও; তাঁর কৃপাকটাক্ষে তোমার সকল অভাব দূর হ'য়ে যাবে।

মানস-প্রিয়ার আধ-আঁকা ছবিখানি তুলে রেখে শিল্পী রাজসভায় এসে দাঁড়াল।

রাজা বল'লেন—উদ্যানবাটিকার ভিত্তিগাত্রে আমার পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকাহিনী তোমার তুলির মুখে ফুটিয়ে তুল্‌তে হবে।

সভাসদেরা আশ্বাস দিলে—আশাতীত পুরস্কার পাবে।

নাগরিকদের আশা হ'ল—দেয়ালজোড়া ছবি দেখে চক্ষু সার্থক করবে।

রাজপ্রসাদতুষ্ট হাতে শিল্পী আবার তুলিকা তুলে নিলে।

* * * * *

শতেক রাজার মুখচ্ছবি ভিত্তিগাত্রে ফুটে উঠ্‌ল; অমাত্যদের ভাবহীন মুখের ছায়া অলিন্দের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যেতে লাগল; নাগরিকদের প্রাণহীন মুখের রেখা শোভাযাত্রার মধ্যে ছড়িয়ে রইল।

শিল্পীর কাজ সাঙ্গ হবার পর—

রাজা তাকে শিরোপা দিলেন; সভাসদেরা দিলে—বাহবা; নাগরিকেরা দিলে—অভিনন্দন।

শিল্পীর মুখ গর্ব্বে, আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌ল।

* * * * *

শিল্পীর বাড়ী ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই তার মানস-প্রিয়ার অর্দ্ধসমাপ্ত মুখখানি রেখায় সমাপ্ত হ'য়ে উঠ্‌ল।

কিন্তু তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হ'ল না—শিল্পীর শত চেষ্টা সত্ত্বেও।

রংএর সঙ্গে রং মিশ্‌ল, রংএর 'পরে রং পড়ল; কিন্তু মুখের সে মৃত্যু-বিবর্ণ ভাব কিছুতেই ঘুচল না।

শিল্পী আহার নিদ্রা ত্যাগ করলে, বিত্ত সম্পদ দূরে ফেললে, সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন দিলে; কিন্তু সে মুখে প্রাণের আভাষ ফুটে উঠ্‌ল না।

* * * * *

শিল্পী তখন কলাদেবীর দ্বারস্থ হ'ল।

দেবী বললেন—শিল্পীর বুকের রক্ত দিয়েই আমি তার মানস-প্রিয়ার মুখে জীবনের আভা ফুটিয়ে তুলি; শিল্পীর মৃত্যুর ভিতর দিয়েই তার মানস-প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করি।

শিল্পী বললে—আমার সেই শ্রেষ্ঠ বলি আজ গ্রহণ করুণ।

দেবী উত্তর করলেন—তা' তো পারি না। স্বর্ণমুদ্রার রঙে যে দিন তুলি রাঙিয়ে ছিলে, সে দিন হ'তে তুমি মৃত। তোমার আত্ম-বলিদানে অধিকার নাই, ফলও নাই।

শিল্পীর সংজ্ঞাহত হাত থেকে তুলিকা খসে পড়ল। আর মানস প্রিয়ার প্রাণহীন মুখ শূন্যে চেয়ে রইল।

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ।

ভারতের নারী।

—:*:—

শ্রীযুক্ত "সবুজ পত্র" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

গত ভাদ্র-আশ্বিনের সবুজপত্রে "ভারতের নারী" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এই সম্পর্কে আরও গুটীকতক কথা বলার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। আমি সুলেখক হইবার যোগ্যতা রাখি না অথবা সেরূপ উচ্চাশাও মনে পোষণ করি না। সুতরাং আমার বক্তব্য আপনাদের পত্রে স্থান পাইবে কি না জানি না। তথাপি সত্য অপ্রিয় হইলেও প্রকাশনীয় ও মাননীয় এই বিশ্বাসে অগ্রসর হইলাম।

আজকাল খবরের কাগজ পড়িলে ও "দেশসেবী"দিগের বক্তৃতা শুনিলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কথা মনে পড়ে। এখনকার শঙ্খ ভেরী, তুরী, দামামা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের শব্দে কর্ণ বধির হয়; এবং ভীম, অর্জ্জুন, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতির বর্ণিত বিক্রম আধুনিক বীরদিগের শৌর্য্য বীর্য্যের কাছে অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই মনে হয়। "ভারতের নারী" প্রবন্ধে যে মহাবীরের উল্লেখ করা হইয়াছে, তৎশ্রেণীভুক্ত সকলের চোখে যদি আগুন থাকিত, তবে বোধ হয়, ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে সত্যেন্দ্র সিংহ প্রভৃতিকেও ভস্ম হইতে হইত। অস্ত্র আইন আছে বলিয়া চোখের আগুনের কথা বলিলাম, ইহাতে বীরত্বের অবমাননা হইল, কিন্তু উপায় নাই। ভারতের নারী সম্বন্ধে এই

"দেশসেবি"গণের মত ও বক্তৃতা আকাশেরও ঊর্দ্ধে উঠে। মাতৃত্বের গৌরবস্থল, ত্যাগের আদর্শ, সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা প্রভৃতি বহুবিধ মহান্ আখ্যা দ্বারা স্ত্রীজাতির গৌরববর্দ্ধন করিলেই যদি তাহাদের অবস্থার উন্নতি হইত, তবে ভারতের নারী সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিবার প্রয়োজনই থাকিত না। অনেক সময় গলাবাজী করিয়া মামলা জেতা যায়, কিন্তু তাহাতে সত্যকে বিচলিত করা যায় না। বার তের বছরের বালিকার মাতৃত্ব লইয়া বাগাড়ম্বর ও দেশের ও ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার এক ভারত ব্যতীত ও হিন্দুসমাজ ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন সভ্য বা অসভ্য সমাজে বা দেশে প্রচলিত আছে কি না সন্দেহ। পরের সঙ্গে কথা কাটাকাটির দক্ষতা ভগবান আমাদিগকে কি উদ্দেশ্যে দিয়াছেন জানি না, তবে এটা ঠিক কথা যে আমি চোখ বুজিলেই আর কেহ আমাকে দেখিতে পাইবে না, ইহা পাগলছাড়া অপর কেহ মনে করে না। নারীকে আমরা কত বড় গৌরবের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি তাহা দু একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে সহজেই বুঝা যায়। এই সে দিন কলিকাতা সহরে পুলিস এক পথভ্রষ্টা, অপহৃতা দশ বৎসরের বালিকাকে উদ্ধার করার পর, তাহার শ্বশুর ও স্বামী স্বীয় পবিত্রতা অটুট রাখিবার জন্য তাহাকে গ্রহণ করা উচিত মনে করিলেন না। হিন্দু আইন, ব্যবহার ও আচার, সকলই স্ত্রীজাতিকে পুরুষের অনেক নীচে রাখিয়াছে। দেশে গ্রামে প্রত্যেক বাড়ীতেই ইহার প্রমাণ আছে। বাগবাজীদ্বারা এতবড় স্পষ্ট সত্যকে চাপা দেওয়া যায় না। সতীদাহ নিবারণের সময় গোঁড়া হিন্দুসমাজ রাজা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে বিরাট সভা করিয়া যে বহু-স্বাক্ষরযুক্ত প্রতিবাদের দরখাস্ত বিলাতে পাঠাইয়া ছিলেন তাহা মনে করিলে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে এখন

লজ্জিত হইতে হয়। ইংরাজি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথা ছাড়িয়া দিলে পল্লীগ্রামে এখনও এমন সংসার আছে যেখানে আহার ও রোগের চিকিৎসা-বিষয়ে নারী পুরুষের সমান যত্নের পাত্র বিবেচিত হয় না। এই সব জানিয়াও ইংরাজদের চেয়ে আমরা যে কোন অংশে ছোট নই, এই প্রমাণ করিতে গিয়া কেহ কেহ গলার জোরে রাত কে দিন করিতে চান। অনেকস্থলে দেখা যায় পবিত্র স্বামী একটু খুঁত পাইলেই স্ত্রীকে ত্যাগ করিব বলিয়া ভয় দেখায়। তিনি তাহা করিলেও অসহায় নিরপরাধিনী সমাজের দয়ার দাবী করিতে পারে না। কার্য্যত স্ত্রীজাতিকে যে এ সমাজের কোন্ স্থানে বসাইয়াছি, এই গেল তাহার এক প্রমাণ।

নারীর পাপের কথা বিশ্বাস করিতে আমরা যত প্রস্তুত ও উৎসুক এত আর কেহ নয়। ভারতের নারী বিলাতের নারীর অপেক্ষা বেশি সম্মান ও শ্রদ্ধা পায় একথা খুব জোর করিয়া যিনি বলিবেন তাঁর ধীরতার খুব অভাব আছে বলিতে হইবে। আমরা নারীর সত্য বা মিথ্যা, কোনরূপ দোষ পাইলেই তাকে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, এরূপ আর কোন দেশে আছে কি? পুরুষের সাত খুন মাপ; তৃতীয় চতুর্থ পক্ষও অনায়াসে চলিতে পারে, কিন্তু বালবিধবা নিষ্ঠুর নির্য্যাতনের আগুনে পুড়িয়া মরিবে আর আমরা বড় গলায় ও হাততালি দিয়া বাহবা দিব, এ দৃশ্য ভারত ছাড়া কোথাও নাই। আজকাল স্বদেশকে ভালবাসি না একথা কেহ বলিতে চাহেন না। এ বেশ কথা, কিন্তু সমাজের অঙ্গে যে গলিতকুষ্ঠ দেখা যায়, তাহাকে সযত্নে ও সম্মানে ঢাকিয়া রাখিলে দেশের মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলই অধিক হবে। স্বদেশপ্রেমের নামে

দেশের কঠিন রোগগুলিকেও যে কেহ কেহ ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছেন ইহা মরণেরই লক্ষণ। ইংরাজের উপর চোখ রাঙাইলে অথবা দাঁত কিড়িমিড়ি করিয়া বাহাদুরী নিলে কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু তাহাদের চেয়ে আমরা কোন অংশে ছোট নই, এই প্রমাণ করিতে গিয়া যদি নিজের দুর্ব্বলতাকে পরাক্রম, ব্যাধিকে স্বাস্থ্যের লক্ষণ, ও কুবুদ্ধিকে বিজ্ঞতা বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করি, তবে ইংরাজের কোন লোকসানই নাই। তাহাতে আমাদের বিকারই প্রমাণিত হইবে।

এইত গেল নারীর কথা। ভারতের নরের কথাও এই প্রসঙ্গে আসিয়া পড়ে। লণ্ডনে সংস্কার আইন (Reform bill) গঠিত করিবার জন্য যে সমিতি (Joint committee) বসিয়াছে তাহাতে সাক্ষ্য দিবার সময় কে একজন বলিয়াছিলেন যে ভারতের বর্ত্তমান সমাজ উল্টান পিরামিডের (pyramid) মত মাথা-ভারী। কথাটা শুনিয়া আমাদের রাজনৈতিক প্যাণ্ডারা—বর্ষাকালে ভেককূলের মত তীব্রস্বরে প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কথাটা কি একেবারে মিথ্যা? প্রাচীনকালে ভারতবাসীর সত্যই ছিল চরিত্রের মূলভিত্তি। এখন কিন্তু রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্য মিথ্যার প্রভেদ উঠিয়া গিয়াছে। সংস্কার আইন এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে খবরের কাগজে প্রবন্ধ পড়িলে বোধহয় যে নিজের কোটকে বজায় রাখিবার জন্য সব পক্ষই মিথ্যাকেও সত্য বলিয়া মামলা ফতে করিবার চেষ্টা করিতেছে। আর্জ্জীদলিলে কোন খুঁত না থাকিলেই হইল, মোকদ্দমা যদি মিথ্যাও হয় তবু মিথ্যাসাক্ষী যোগাড় করিয়াও জিতিতে হইবে, এই চেষ্টাই সব রাজনৈতিক গণ্ডগোলের মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে। যেহেতু

আমরা সাহেবদের দেশের মত শাসনপ্রণালী চাই, অতএব আমরা জোর করিয়া বলিব যে দেশের চাষাভুষা পর্য্যন্ত সংস্কারের অপেক্ষায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বসিয়া আছে; কারণ ইহা না বলিলে যদি না পাই। অভিনেতা রঙ্গমঞ্চে রাজা সাজিবার সময় মুখমণ্ডলে নানা-রকম রং প্রলেপ দেয় এবং ভাড়া-করা রাজপোষাক পরে। সেইরূপ নেতা-নামধারী অনেকেই পাশ্চাত্য দর্শকের মন ভুলাইবার জন্য জীর্ণ, ক্ষতযুক্ত সমাজদেহকে বহু পুটিং দিয়া সাজাইবার চেষ্টায় ব্যস্ত। ভেদবুদ্ধি ও অন্ধ-কুসংস্কার এখনও দেশে পূর্ণমাত্রায় বজায় আছে, কেহ কেহ স্বজাতি-প্রেমের ভাণ করিয়া এই সকলের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতেছেন। প্রত্যেক বর্ণের মধ্যে ছোট ছোট এমন গণ্ডী আছে যাহার সীমা লঙ্ঘণ করা অসমসাহসের কার্য্য; কিন্তু এসকল দেশ-উদ্ধারকারীদের বিবেচনার মধ্যে আসে না। অল্পসংখ্যক লোক ইংরাজী শিখিয়া চীৎকারে গলা ফাটাইয়া বলিতেছে, "ইংরাজের সমাজে যেমন সাম্য আছে, আমাদেরও তেমনি আছে, আমাদিগকে স্বায়ত্ত-শাসন দাও।" এদিকে বাংলার গ্রামে গিয়া দেখ, সমাজ যাহাদিগকে অতি নীচ ও অবজ্ঞার পাত্র করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের কি দুঃখ দৈন্য কি নির্জ্জীব জীবন। হিন্দুসমাজ পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া বহু কষ্ট ও চেষ্টাদ্বারা নিজের পায়ে পক্ষাঘাত আনিয়াছে। রোগ যত কঠিন হইতেছে বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় তাহার প্রলাপও তত বাড়িতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে লেপ্টেনেণ্ট উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় হিন্দু সমাজকে ধ্বংসের মুখে ধাবিত দেখিয়া দু'একটী অপ্রিয় সত্যের আলোচনা করিতে গিয়া গোঁড়াদের এমন কি অনেক "দেশহিতৈষীর" তিরস্কার ও বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে অনেক প্রকার উন্মাদ

রোগের বর্ণনা আছে, কিন্তু এরূপ উৎকট রোগ চিকিৎসকদের জ্ঞানেও আসে নাই। হিন্দুসমাজ জলাতঙ্ক রোগীর ন্যায় জলে পড়িয়া মরিতে চায়, বারণ করিলে তাড়িয়া আসে। কয়েকজন লোক লেখাপড়া শিখিয়াছে এবং ইংরাজের সঙ্গে তর্ক করিতে পারে আর সমাজের সকল শ্রেণীর লোক অশিক্ষিত, অসার, নির্জ্জীব, এ সমাজের তুলনা উল্টান পিরামিডের সহিতই হয়। চক্ষু খুলিয়া দেখিলে সকলেই দেখিবেন হিন্দুসমাজে বাঙ্গালী শ্রমজীবির সংখ্যা ক্রমেই কমিতেছে। নৌকার মাঝি, কলের মজুর, চাষা, কুলী প্রভৃতি বলিষ্ঠ শ্রমজীবী বাঙ্গালী লোপ পাইতে বসিয়াছে। হিন্দুসমাজের মাথাটী মোটাই আছে, হাত পা নাই বলিলেও চলে। দেশের সমাজের যারা মেরুদণ্ড, তাহারা দুর্ব্বল, ক্ষীণজীবি। তাহাদের শিক্ষার ও উন্নতির কোন চেষ্টাই নাই, তাহারা সমাজের লাঞ্ছনা ও অবমাননা এখনও সহ্য করিতেছে, আর জন কয়েক লোক তাহাদেরই প্রতিনিধি সাজিয়া হৈ চৈ করিতেছে। সমাজ নিজের প্রতি কর্ত্তব্যে উদাসীন নিজের দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতার বিষয়ে অন্ধ, অথচ মুষ্টিমেয় লোক নেতা সাজিয়া গোলমাল করাকেই কর্ত্তব্য মনে করিতেছে, যেন ইংরাজকে গাল দেওয়াই স্বদেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা। যাহারা গলাবাজিতে পটু এবং বিলাত গিয়া বাহাদুরী লইতে চেষ্টিত তাহারা কি বাংলার পল্লীস্বাস্থ্য ও এক শ্রেণীদ্বারা অপর শ্রেণীর উপর অত্যাচারের দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন? যাহারা নিজের দেশভাইকে সর্ব্ববিষয়ে নিজের সমান জ্ঞান করিতে শিখে নাই, পরের কাছে নিজেকে জাহির ও স্বীয় দোষ গোপন করাই যাহাদের কার্য্য—বিধাতা তাহাদের শাসন হইতে দেশকে রক্ষা করুন। নারীর অসহায় অবস্থার সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর

অশিক্ষিত লোকের অসহায় অবস্থার অনেক সাদৃশ্য আছে। দেশকে ভালবাসিতে হইলেই যে দোষকেও ভালবাসিতে হইবে একথা কোন শাস্ত্রে নাই। "আমি তোমার চেয়ে খাটো না" একথা বলিবার পূর্ব্বে নিজেকে একবার মাপিয়া দেখা উচিত। আমি বড় কি ছোট তাহা আমার চেয়ে পরেই ভাল বলিতে পারে। মানুষ নিজেই যদি নিজের সুবিচার করিতে পারিত তবে অপর বিচারকের দরকার হইত না।

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নড়াল কলেজ
২৪ নভেম্বর ১৯১৯।

আলো ও ছায়া।

—:০:—

বীণাকে কথা দিয়েছিলাম বড়দিনের সময় তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যাব। তাঁর সাধ হয়েছিল পোষকালী দেখে পুণ্যসঞ্চয় করবেন—আমার সখ চেপেছিল কংগ্রেস দেখব।

যথাসময় বীণা আমাকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। জবাব ঠিকই ছিল—আমি বল্‌লাম কথাটা আমারও মনে আছে, কিন্তু ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার ভয়েই সেটি রাখতে পারছি নে।

—ও সব ছুতো শুনতে চাইনে আমি।

—এটা কি একটা ছুতো হল? খবরের কাগজখানা পড়ে দেখ দেখি একবার।

—ও সব বাজে পড়া রেখে এই চিঠিখানা আগে পড়—বলে' বীণা আমার হাতে একখান চিঠি দিলেন।

—এ কি? তোমার দাদার লেখা যে! ওঃ তুমি একেবারে ডাক্তারের সর্টিফিকেট হাজির করেছ সঙ্গে সঙ্গে।

—করব না? তুমি যা বলবে তাই মেনে নিতে হবে নাকি?

—আচ্ছা দেখি সতীশ কি লিখেছে।

পড়ে' বুঝলাম চিঠিখানা বেনামীতে আমাকেই লেখা। সতীশ লিখেছে যে কলকাতায় অসুখ হচ্ছে বলে' যদি কারো ভয় হয়, সে

বাইরের লোকের—যাঁরা শুধু খবরের কাগজ পড়ছেন। সে আরও লিখেছে যদি কলকাতায় আসার মতলব থাকে, তবে অসুখের ভয়ে পিছিও না, কারণ বছরে এমন দিন এবং জগতে এমন স্থান পাওয়া যাবে না, যখন মানুষ মরবে না বা যেখানে তার অসুখ হবেনা।

অগত্যা আমাকে হার মানতে হল।

আমি কলকাতায় যাব শুনে বন্ধুরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন, এমন কি ভূষণ এসে স্পষ্টই বল্‌লে—তুমি ক্ষেপেছ না কি?

—কেন বল দেখি?

—কলকাতায় যাচ্ছ এই সময়ে—তাও আবার যাচ্ছ সপরিবারে!

—হাঁ, তা যাচ্চি বটে, কিন্তু ক্ষেপি নি—

—তার বড় বাকীও নেই। যত লোক কলকাতা ছেড়ে পালাচ্ছে, আর তুমি যাচ্ছ সেখানে মজা দেখতে।

—পালাবে কোথা ভাই—পালিয়ে কি নিষ্কৃতি আছে? এখানেও কি লোক মরছে না? বরং খতিয়ে দেখলে বুঝবে লোক এখানেই বেশি মরছে।

—তা হয়ত সত্য, কিন্তু এ হ'ল দেশ, আর সে—

—কলকাতাও রাজধানী। বাঙলা দেশের সেরা জায়গা।

অতঃপর হতাশভাবে ভূষণ বল্‌লে—অর্থাৎ তুমি যাবে।

আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম হাঁ।

—তবে বাধা দেওয়া বৃথা। কিন্তু সাবধান ভাই, বেশি দিন থেকো না এবং সাবধানে থেকো।

—সাবধানে থাকতেই হবে কারণ প্রাণটা ঠিক পড়ে'-ত পাওয়া নয়। আর—

—কবে ফিরবে?

—তার ঠিক নেই, তবে মিছামিছি দেরী করব না। যাচ্ছি বেড়াতে, সখ মিটে গেলেই ফিরব।

কলকাতায় গিয়ে দেখলাম সতীশের কথাই ঠিক। বোধ হয় না যে সহরে মারীভয় হয়েছে।

তিন চার দিন বেশ কাটল। ভয় ও ভাবনার কথা প্রায় ভুলেই গেলাম। শুধু সকালবেলা খবরের কাগজ পড়বার সময় একটু ভাবনা হ'ত। কিন্তু ভয়ের খবর তাতেও ছিল না। অসুখ দিন দিন কমে আসছিল।

হঠাৎ তারপর একদিন বিকেলের দিকে বীণার শরীরটা খারাপ বোধ হল, পরদিন দেখেশুনে সতীশ গম্ভীর হয়ে বল্‌ল—তাইত—

আমি জিজ্ঞাস করলাম—কি দেখলে?

—নিউমোনিয়া হয়েছে—সাবধানে থাকতে হবে।

খুব সাবধানেই থাকা হ'ল—ভাল ডাক্তার দেখ্‌ল, দামী ওষুধ পড়ল কিন্তু কোন ফল হল না।

বীণাকে ধরে রাখা গেল না।

ছেলে মেয়ে দুটিকে সেখানেই রেখে পরদিন সকালের গাড়ীতেই আমি কলকাতা ছাড়লাম।

গাড়ী ছাড়বার তখন একটু দেরী ছিল। কামরার ধারে সতীশ চুপকরে দাঁড়িয়েছিল। ভিতরে আমিও তেমনি বসেছিলাম।

সামনে একটী ভদ্রলোক খবরের কাগজ পড়ছিলেন, তিনি বলে উঠলেন—আঃ বাঁচা গেল, ইনফ্লুয়েঞ্জাটা তাহলে গেল এতদিনে।

চকিতের মত তাঁর দিকে চাইতে তিনি কাগজখানা আমার সামনে ধরে আবার বললেন—এই দেখুন মশাই, কাল মোটে একটা মরেছে। এইবার নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

ধীরে ধীরে আমার হাতখানা নিয়ে সতীশ শুধু তার হাতের মধ্যে চেপে ধরল।

ঝাঁপ দিয়ে পরক্ষণেই গাড়ী ছেড়ে দিল।

প্রবোধ ঘোষ।

ঝিলে জঙ্গলে শীকার।

—:*:—

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৭।

স্নেহের অলকা কল্যাণ,

মধ্যপ্রদেশের সীমান্তে আমারি পরিচিত কোন স্থানে, পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ হতে একটি ব্যাঘ্র উপস্থিত হয়ে সপ্তাহ তিনেকের মধ্যে অনেকগুলি নরনারী হত্যা করেছে, এই সংবাদ পেলাম। লোকজনে ভারী ভয় পেয়ে গেল, পাহাড়ে জঙ্গলে তাদের কাঠভাঙা, ফল কুড়িয়ে আনা, একরকম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বল্লেই হয়। নিজে অলক্ষ্য থেকে শীকার ধরবার পক্ষে সেই ব্যাঘ্রটির বিশেষ সুবিধাজনক, অনেকগুলি জায়গা জুটেছিল। যে পথ বেয়ে গরুর গাড়ীর সারি ঘুরে ঘুরে আসে সেইখানে লুকিয়ে বসে তিনি অনেক বলি সংগ্রহ করেছেন শুনলাম। তিনি বাঘিনী হলেও শীকারী কম ছিলেন না, গাই বলদ ছাগল ভেড়া সবই উজাড় করছিলেন। স্থানীয় শীকারী তাকে মারবার বেশ একটি সুযোগ পেয়েছিল, সন্ধ্যেবেলায় সে তখন মৃত গরুটি ভক্ষণের চেষ্টায় ফিরছিল, কিন্তু বেচারা শিকারীর কাছে যে কার্ত্তুস (cartridge) ছিল তাতে আওয়াজ হয় নি, বাঘিনী সেই যে চম্‌কে পলায়ন দিলে, আমরণ সে আর প্রলোভনে ভোলে নি বা ফাঁদে পা বাড়ায় নি। কাজের শিকলে আমরা যেমন বাঁধা, তাতে স্বাধীনভাবে আনন্দের সন্ধানে যাওয়া আমাদের পক্ষে সহজ

নয়, যদিও একথা বড় একটা কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না জানি, কেননা আইন ব্যবসায়ের নাম স্বাধীন-ব্যবসা। সে যাই হোক ব্যবসায়জীবীর জীবন স্বাধীন নয়, কেননা তিনি মক্কেলের কাছে বাঁধা। যার পয়সা খান, তার কাজ না বাজিয়ে, তাঁর আর কোন দিকে মনোযোগ করবার সুযোগ হয় না। আমি মাঝে মাঝেই কাজের মধ্যেই খেলার সুযোগ করে নি, তাতে অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়, গাঁটের কড়িও মন্দ খরচ হয় না (আর একথা আগে হতেই বলে রাখা ভাল, এ বস্তুর প্রাচুর্য্য আমার বড় একটা নেই)। থলির অর্থ আর দেহের সামর্থ্য যথেষ্ট ব্যয় করে মফঃস্বলে মামলা করতে গিয়ে সপ্তাহান্তে যে দুদিন কাছারী বন্ধ থাকে আমি সেই অবসরে দু' একবার শিকারের যোগাড় করেছি। মনিব্যাগ খালি হয়েছে বটে কিন্তু শীকারের ঝোলায় বাঘ ভরেছি। একবার একজন জজ মজা করে আমায় বলেছিলেন মফঃস্বলে আমার দুই শীকারই জোটে—এক মক্কেল, দ্বিতীয় বাঘ। তাঁর বোধ হয় মনে হয়েছিল, পুরাণ ব্যাধির মত এ দুটোই আমায় পেয়ে বসেছে। আমি যখন প্রথম ব্যারিষ্টারী ব্যবসা আরম্ভ করি তখন আমার দু'একজন হিতৈষী মক্কেলদের বোঝাবার চেষ্টা করে-ছিলেন আইনের চেয়ে শীকারেই আমার বুদ্ধিটা খেলে ভাল। যে সব মানুষের শীকার-বাতিক আছে, ইংরাজ তাদের প্রতি একটু পক্ষপাতী। ছুটির সম্বন্ধে মফঃস্বলের কাছারীর চেয়ে হাইকোর্টে আমাদের ভাগ্য ভাল, সেখানকার মত চাঁদ দেখে এখানে মুসলমান পরবের ছুটি হয় না আর তা ছাড়া সৎ খৃষ্টানের মত তাঁরা একদিন ছেড়ে দুদিন কর্ত্তব্য বোধে সম্পূর্ণ বিশ্রাম করে থাকেন। সেবারে দোলের সময় এই সূত্রে আরো দিন কত বেশি ছুটি পাওয়া গিয়েছিল।

তবে এই সব অল্পদিনের ছুটির মুস্কিল এই যে, আপনাকে একেবারে ছেড়ে দেওয়া চলে না, মনের মধ্যে কাজের ফাঁসটা টানাই থাকে, বেশ হাত পা ছড়িয়ে কিছু করা ঘটে না।

শীকারের লোভে K. G. B. পথের ধারে একটা ষ্টেশনে এসে, আমার সঙ্গ ধরলেন। রাতদুপুরে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম, আর যাদের উপরে তত্ত্বাবধানের ভার ছিল তাঁরা পোঁটলা পুঁটলি সমেত আমাদের থানায় নিয়ে তুললেন। এমন নিরাপদ স্থানে আমাদের প্রথম আর সবেমাত্র রাত্রিবাস। লোহার গরাদে-দেওয়া বারান্দাটি স্থান-মাহাত্ম্য প্রচার করছিল। আমরা সেখানে গিয়ে পৌঁছবার পর, একজন হাসতে হাসতে কোথায় এসেছি, সে কথা আমাদের জানালেন। শুনে আমার বন্ধুর যে হাসির ফোয়ারা ছুটল তা আর বন্ধ হ'তেই চায় না। তাঁর যেন হাসির হিষ্টিরিয়া হয়ে পড়ল, আমি তাকে বোঝালাম —

Stone walls do not a prison make,
Nor iron bars a cage.

কারাগার হলেও নির্দ্দোষী আমাদের কাছে সেটি শান্ত আশ্রমপদ বলেই মনে হয়েছিল।

ভোর হ'তে না হ'তে আমরা রাজকীয় সমারোহে যাত্রা করলাম। প্রশস্ত রাজপথ, সুন্দর আধুনিক রথ, কিছুক্ষণ পরে ব্রিটিশরাজের একজন প্রহরী আমাদের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করলে। আমাদের অভ্যর্থনার জন্যে ঘোড়ায় চড়ে সে দশ ক্রোশ পথ এসেছিল। এর কিম্বা এরি মত লোকের হাত এড়িয়ে যাওয়া বড় সহজ কথা নয়।

তবু মনে করলাম আবার যদি এ পথে আসি, তবে যেন শীকারের সুবন্দোবস্তের জন্যে এম্নি কারো হস্তগত হ'বার সৌভাগ্য আমার ঘটে। অতঃপর হস্তিপৃষ্ঠে কয়েক মাইল যাবার পরই আমরা শিবিরে গিয়ে পৌঁছলাম। এর আগেই শীকার সন্ধানে লোক জড় করে চারিদিকে পাঠান হয়েছিল। শৈলমালাবেষ্টিত যে স্থানটিতে আমাদের শিবির সংস্থান হয়েছিল, সে যেন এক স্বপ্ন-রাজ্য। গোধূলির শ্যামচ্ছায়ায়, পাদপরাজি আচ্ছাদিত বনভূমি যখন স্নিগ্ধ অন্ধকারে আবৃত হয়ে এল, তখন চারিদিক হতে সাম্বর মৃগের ঘণ্টাধ্বনির মত আহ্বান রব, বারম্বার আমরা শুনতে পেলাম। সে যেন বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আরতির মঙ্গল বাদ্য।

বাঘিনী সম্বন্ধে যে সংবাদ আমরা জানলাম, সে হচ্ছে পাঁচ ছয় দিনের বাসি খবর, আমার বন্ধু সেটা সুবিধার কথা মনে করেন নি, আমার কিন্তু তার উল্টোটাই মনে এল। তবু উৎসাহের গায়ে এমন শীতল প্রলেপ বাঞ্ছনীয় নয়, তা স্বীকার করাই ভাল। যাই হোক প্রভাতেই ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হলেন, তাঁর হাসিমুখ দেখে আমাদের মুখও হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সংবাদ এল, সূর্য্যোদয়ের শুভলগ্নে খানিক দূরে বাঘিনী একটি স্ত্রীলোককে ভোগে লাগাবার উদ্যোগ করছিল, পারে নি, সে কোন রকমে একটা পাথরের স্তূপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বেঁচে গেছে। নিরাশ হয়ে ব্যাঘ্রী একটি নালার মধ্য দিয়ে অন্য পথে যাত্রা করেছে। নালার পাশের ভিজে বালিতে তার পায়ের টাট্‌কা চিহ্ন খুব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, আর বনের মধ্যে দিনের বেলা লুকিয়ে থাকবার জন্যে যে পথে চলে গিয়েছে, সেখানেও তার পায়ে হতে ঝরে-পড়া বালি আর কাদার দাগ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। নালার

পাড়ে লাফিয়ে উঠে যেখানে সে পাহাড়ে চড়েছে সেইখান হতেই তাকে অনুসরণ করে যাওয়া কঠিন হয়েছিল, কোথাও গড়িয়ে-পড়া একখণ্ড পাথর, কোথাও বা পায়ের চাপে মুচড়ে-পড়া সুকুমার লতা গুল্ম, কোথাও বা বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত তৃণগুচ্ছ, এই দেখেই পথ আবিষ্কার করে অগ্রসর হচ্ছিলাম। সত্বর অগ্রসর হওয়া ঘটে ওঠে নি, কেননা স্থির নিশ্চয় না হয়ে, পা বাড়ান আমরা যুক্তি-সিদ্ধ মনে করি নি। দিনের আলোতে পাহাড়ের নিরাপদ আশ্রমটি ছেড়ে সে অধিক দূরে অগ্রসর হবে না জেনে নিঃশব্দ ধীর পদক্ষেপে আবার আমরা নালার কাছে ফিরে এলাম। নালার কাছে পলায়নের তিনটি ঘাট, তার দুটি ভিন্ন পথ ছিল। শেষের পথ দুটি নালা হতে পাহাড়ের দিকে গিয়েছিল। ঘাট তিনটি একজন লোকেই পাহারা দিতে পারে।

আধ মাইল দূর হতে বাঘকে তাড়া দিয়ে আনবার বন্দোবস্ত করা হল। আমি আট ফুট উঁচু একটি পাথরের উপর উঠে আমার বসবার মোড়াটি এমন জায়গায় রাখলাম, যেখান হতে তিনটি ঘাটই আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। আমার ডাইনে ও সম্মুখে আরো দুটি পাথরের ঢিবি, আর গুটিকত গাছও ছিল। ঘাটের পথ চেয়ে দু'চারিটি সরু গলি, এরি মাঝ দিয়ে চারিদিক ছড়িয়ে পড়েছিল। আমি পাথরের উপরে মোড়া পেতে বসেছিলাম। তার উপরে গুটিকত গাছ ছিল। গাছের ডালগুলি এম্নিভাবে নামিয়ে দিয়েছিলাম যাতে করে আমি আড়ালে থাকতে পারি, অথচ চারিদিক দেখবার কি বন্দুক চালাবার কোন অসুবিধা না ঘটে। কত সামান্য আড়াল হলেই যে লুকোবার সুবিধা হয়, শীকার তোমার পাশ দিয়ে অসন্দিগ্ধ ভাবে চলে যায়, তোমায় দেখতে পায় না, সে কথা সহজে বিশ্বাস হয় না; মানুষের গন্ধ হয়ত

বা পায় কিন্তু বেলা বাড়তে আরম্ভ করলে সে গন্ধও কম হয়ে আসে। আর তুমি যদি চুপচাপ বসে থাক, তাহলে সেদিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হবার, ধরা পড়বার সম্ভাবনা বড় একটা থাকে না। প্রকাণ্ড একটা হিংস্র জন্তু পাশ দিয়ে যখন চলে যায় তখন স্থির হয়ে থাকা কঠিন কাজ কিন্তু অভ্যাস ও সাধনার বলে, শীকারীর মজ্জাপেশী ক্রমে ইস্পাতের মত দৃঢ় হয়ে ওঠে তখন কোথাও আর এতটুকু কাঁপে না কি নড়ে না। আমি যে জায়গাটি পছন্দ করে নিয়েছিলাম সেখান হতে চারিদিকে গাছপালা আর গলি ঘুঁজির জন্যে হাত বিশেক তফাতে গুলি করাটা তেমন নিরাপদ ছিল না। সেখানে আমার ডানে হতে পাহাড়টা গড়িয়ে নালার দিকে নেমে গিয়েছিল। K. G. B.-কে ছিলেন একখানি ছোট্ট খাটিয়া মাচান করে বেঁধে দেওয়া অন্য একটি পাহারার জায়গা, সেইখানকার একজন গৌঁটিয়া তাঁর সঙ্গে ছিল—চট করে গাছে চড়ে পড়বার ক্ষমতা তার অদ্ভুত। আর তা ছাড়া স্থান যতই সঙ্কীর্ণ হোক না, সে তারি মধ্যে অবলীলাক্রমে আপন ঘুরবার ফিরবার সুবিধা করে নিত, কোন রকমে আড়ষ্ট হ'ত না। এই চতুর লোকটির তা ছাড়া বন্দুকের তাক্‌ও ছিল ভাল।

প্রায় ঘণ্টা খানেক প্রতীক্ষার পর, তবে বনের মধ্যে হতে যে সব শীকারীরা বাঘ তাড়া করে আনছিল, তাদের সোরগোল শোনা গেল, আরো কিছুক্ষণ সময় যাবার পর আদের মধ্যে জনকয়েককে পাহাড়ের মাথার উপর দেখতে পেলাম। মুহূর্ত্তের মধ্যেই দেখলাম স্থূলাঙ্গী একটি ব্যাঘ্র ত্বরিত গমনে নালার মধ্য-ঘাট পার হয়ে আসছে, নিমেষের জন্যে সে প্রস্তরস্তূপের ব্যবধানে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল—পর মুহূর্ত্তেই তার মস্তক আর গ্রীবাদেশ দৃষ্টিগোচর হবা মাত্রই আমি তার স্কন্ধদেশ

লক্ষ্য করে বন্দুক ছুড়লাম। সে আমার বাঁয়ে দশ গজ দূরে ছিল। আমার বন্দুক তুলতে সামান্য কি একটু শব্দ হয়েছিল, তাতেই সে ঘাড় ফিরলে, গুলি তার কাণের মধ্যে দিয়ে ঘাড়ে গিয়ে লাগল তৎক্ষণাৎ সে ধূলিলুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। দ্বিতীয় গুলি মারবার জন্যে আমি প্রস্তুত হচ্ছিলাম, কিন্তু যখন দেখলাম সে আর নড়চড় করল না, তখন বন্দুকের যে নল খালি হয়ে গিয়েছিল সেইটি আবার পুরে কি ঘটে দেখবার জন্যে অপেক্ষা করে রইলাম। শীকারীরা কয়জন পাহাড়ের মাথা হতে একটু নেমে আমার ডাইনের দিকে আর বাকী কয়জন সম্মুখে কিছু দূরে সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যতক্ষণ মৃগয়াভিনয়ের যবনিকা পতন না হয়, ততক্ষণ এ সাবধানতার বিশেষ আবশ্যক। জয়গর্ব্বে উৎফুল্ল আমি আর স্থির হয়ে থাকতে পারলাম না, সঙ্কেত-সূচক বাঁশীটি বাজিয়ে দিলাম, তখনই চারিদিক হতে জয় জয় শব্দে মহাকোলাহলে সকলে সে সঙ্কেতের অভ্যর্থনা করল। K. G. B. আর গৌঁটিয়া দুজনেই আমার কাছাকাছি ছিলেন, সবাই এসে ঘিরে দাঁড়িয়ে ব্যাঘ্র-রাজ-পত্নীর রাজ-যোগ্য অঙ্গচ্ছেদ আর বরাঙ্গের প্রশংসা করতে লাগলেন। পাহাড়ের মাথার উপর যে সব শীকারীরা ছিল তাদেরি মধ্যে জন কয়েক সময় মত এসে পৌঁছতে পারে নি, সেই সঙ্কট স্থান হতে নেমে আসবার জন্যে তারা ব্যাকুল অথচ ব্যর্থ চেষ্টায় নিযুক্ত ছিল। এই খানেই ২রা সেপ্টম্বরের ভল্লুক-বিভ্রাট ঘটেছিল, সে কথাতো তোমরা আগেই শুনেছ।

অবিলম্বে বাঘিনীকে এক পর্য্যাঙ্কে, ভল্লুকটিকে অপর একটিতে শয্যা রচনা করে দিয়ে বাহকেরা সমারোহে শোভাযাত্রা করল, আমি আর K. G. B. গজারোহণে আর সেই গৌঁটিয়া গজ-রাজের পুচ্ছ দেশে

লম্বমান হয়ে, তাদের অনুসরণ করলাম। পথে গ্রামবাসীরা আমাদের সঙ্গ নিলে, মহানন্দে তারা ঢাক ঢোল বাজিয়ে চল্‌ল। বাদ্যের সঙ্গে নৃত্যও বাদ যায় নি, সংহাররূপিণী শার্দ্দূল-বধূর মৃত্যুতে তাদের আনন্দ আর ধরে না। কাছে দেখলাম বাঘিনীটি কৃশোদরী তার চামড়াখানি বড়ই সুন্দর। আমার এবারের হোলির উৎসব বনের মধ্যে, নরখাদক ব্যাঘ্রের তপ্ত রক্তের আবীর কুঙ্কুমে সুসম্পন্ন হল।

আমরা অবিলম্বে এ শুভসংবাদ দশ ক্রোশ দূরের তার আপিসের সাহায্যে বাড়ীতে, আমাদের নিমন্ত্রণ কর্ত্তাকে আর আর মহানুভাব বন্ধুদের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। সন্দেশ-বাহকই আবার সেগুলির উত্তরও নিয়ে এল, তবে বাড়ী আর আমার কৃতজ্ঞ নিমন্ত্রণ কর্ত্তার কাছ হতে যে আন্তরিক সহানুভূতি পূর্ণ অভিবাদন পেয়েছিলাম, এমন আর কেউ করে নি।

শীকার করে এমন সুন্দর বাঘছাল যদি লাভ হয়- তবে তাকে রক্ষা করবার জন্যে বিশেষ যত্ন নিতে হয়। আমরা প্রসিদ্ধ চর্ম্ম শোধনকারী Messrs Rowland Word-এর বরাবর এ চামড়া লণ্ডন সহরে পাঠিয়ে দিলাম। তখন জর্ম্মানদের অনুগ্রহে জাহাজ ডুবির অসম্ভব ছিল না। এর আগে, আর পরে, যে সব পার্শ্বেল পাঠিয়ে ছিলাম সবগুলিরই পৌঁছ সংবাদ যথাসময়ে আমার হস্তগত হ'ল, কিন্তু অনেকদিন কোন সংবাদ না পাবার পর হৃদয় বিদারক সংবাদ এল শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধাচরণে পার্শ্বেলটি হারিয়ে গিয়েছে। হায়, এমন বিজয় আনন্দের পরিণাম এই শোকাবহ ব্যাপার! এ ক্ষতিপূরণ হবার উপায় ছিল না—হূণ পাশবতাই এই ক্ষতির মূল কারণ!

ক্রমশ—

ডিমোক্রাসি।

—:০:—

আজকের দিনে লোকের সঙ্গে কথাই কও আর খবরের কাগজই পড়ো, কানে আসবে ও চোখে পড়বে শুধু একই কথা—ডিমোক্রাসি। এই কথাটা আমাদের মনকে এমনি পেয়ে বসেছে যে সেখানে অন্য কোনও ভাবনা চিন্তার আর স্থান নেই—অবশ্য এক পেটের ভাবনা ছাড়া। অথচ দেখতে পাই ও-কথাটার অর্থ প্রায় কেউ বোঝেন না। আমাদের নীরব জনসাধারণ ও আমাদের পলিটিকাল বাক্যবাগীশেরা এ বিষয়ে সমান অজ্ঞ। এ অবস্থায় কথাটা যে-দেশ থেকে এসেছে সে-দেশের দু'চারখানা বই একটু নাড়া চাড়া করা গেল—কথাটার যথার্থ মানে বোঝবার জন্যে। এই রাজনৈতিক সাহিত্যালোচনার ফল এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করছি। বলা বাহুল্য যা লিখছি তার ঠিক নাম হচ্ছে "নোট"।

(২)

প্রথমত মর্লি সাহেবের Compromise-খানা আবার পড়লুম। আমাদের দেশে একদল লোক আছেন যাঁরা সাংসারিক অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়ে বুদ্ধির গোড়ায় কলম চালান। কর্ম্মের পথ সরল নয়, অতএব বুদ্ধি খুঁড়িয়ে চলুক—এই তাঁদের উপদেশ। সম্ভবনীয়তার রাশ মেনে চলতেই হবে, তা না হলে অতিবুদ্ধি গলায় এবং পায়ে দড়ি জড়িয়ে

খানায় পড়বে—খানায়-পড়া অবস্থা যখন সর্ব্ববাদী নিন্দনীয় তখন গোড়া থেকে বুদ্ধিকে ধীর কদমে চালানই শ্রেয়। কিন্তু তাড়ির মাদকতা ময়দার মতন নির্জ্জীব এবং নিরেট পদার্থের পক্ষে রুটীতে পরিণত হবার জন্য যেমন দরকারী, তেমনই ভাবরাজ্যে বুদ্ধির সাহসিকতা, উত্তেজনা এবং সূক্ষ্মতা নিরেট ঘটনাবলীকে সজীব করবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন—অন্তত এই ত ইতিহাসের শিক্ষা। ভল্‌টেয়ার, রুশো, ডিডেরোকে বাদ দিয়ে ফরাসী-বিপ্লবের ইতিহাস-চর্চ্চা যা, হ্যামলেটকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট অভিনয় করাও তাই। ভাব এবং কর্ম্মের ঘটকালীতে মর্লি সাহেবের বিধান নেওয়াই বিধেয়, কেননা তিনি নিজে একজন কর্ম্মবীর। তাঁর মত এই যে, বুদ্ধির বন্ধুর পথে সাহসে ভর করে চলাই উচিত, কর্ম্মক্ষেত্রের স্বাভাবিক জড়তার ফলে ভাবের দুর্দ্দমনীয়তা সহজেই মন্থরগতিতে দাঁড়াবে। ভাব যদি প্রথম থেকেই সম্ভবের কাছে মাথা নীচু করে তাহলে না-হয় বুদ্ধির বিকাশ, না-হয় ভাবের প্রকাশ।

এখন স্মার্ত্তের কথা যদি সত্য হয় তাহলে মানতে হবে যে, বর্ত্তমান ভারতে প্রত্যেক বুদ্ধিমান লোকের কাঁধে একটা বিশেষ রকমের দায়ীত্ব এসেছে—বিশেষত বাঙালীর, সে হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিকে খাটানোর দায়। তবে বাঙালীর নামে আগে থেকেই বদনাম রয়েছে যে, তারা কুছ্-কাম্‌কা নেহি। আমি বলি এ নিন্দা অনর্থক, কেননা আমার বিশ্বাস যে পৃথিবীতে কাজের লোকের অভাব নেই, অভাব আছে শুধু মাথা ঘামাবার লোকেরই. আর সেই অভাব যখন বাঙলাদেশ প্রায় সব ক্ষেত্রেই পূরণ করেছে তখন রাজনীতির ক্ষেত্রেও করবে। আমার দুঃখ এই যে আমরা পূর্ব্বে ঐ অভাব পূরণ করেছি কোন দায়ীত্ব বোধে নয়। কি সাহিত্যে,

কি ধর্ম্মে,, কি বিজ্ঞানে দায়ীত্ব-জ্ঞান নয়, প্রকৃতির তাড়নাই আমাদের ভাবের গতি নিরূপণ করে দিয়ে থাকে। এক রাজনীতির ক্ষেত্রেই আমরা মনের খেয়াল অপেক্ষা নিজেদের কর্ম্ম ক্ষমতা, চরিত্রবল একাগ্রতা প্রভৃতি গুণের উপর বেশি নির্ভর করি, কেননা কি সাহিত্য কি ধর্ম্ম স্বীয় চেষ্টায় তত গড়ে তোলা যায় না, যত যায় রাজ-নীতি ও সমাজ-নীতি। এই হচ্ছে জগতের নিয়ম। কিন্তু সব বিষয়েই আমরা সৃষ্টি-ছাড়া, তা না হলে একই গলায় একই ক্ষেত্রে ডিমোক্রাসি এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের জন্য আবেদন করতুম না। Mill এবং Comte সমাজ-সংস্কারে সাধারণ মানুষের বুদ্ধির জড়তা দেখে ভগ্নমনোরথ হয়েছিলেন, সেই জন্য লোকের জড়-বুদ্ধির মূলে তাঁরা কুঠারাঘাত করলেন—নব্যন্যায় লিখে। আমাদের দেশে দেখছি যুক্তির সাহায্যে জ্ঞানের পথ মুক্ত রাখতে কেউ ব্যস্ত নন, তাই বীরবলের কথা হচ্ছে 'এখন ভিক্ষের ঝুলি টাঙ্গিয়ে রেখে বুদ্ধি চালনা করা যাক। আগে পথ-বিচার করা হোক, না-হলে উদ্ভ্রান্ত হয়ে যাব'।

(৩)

ধরা যাক্ ডিমোক্রাসি কথাটা। আমাদের ধারণা ও-একটা ধর্ম্ম, ন্যূনকল্পে একটা মহৎ-আদর্শ। কল্পনার যাদুতে যাই ভাবা যাক্ না কেন, ওটা আসলে অনেক রকম শাসন-প্রণালীর মধ্যে একটা বিশেষ প্রণালী মাত্র। আমাদের দেশ-নায়কেরা কিন্তু এ কথাটি না বুঝে ও-বস্তুকে ধর্ম্ম হিসেবে ধরে নিয়েছেন, তাই তাঁদের প্রত্যেক বক্তৃতায় ভিক্ষার চাল কাঁড়া কি আ-কাঁড়া, ঠিক করা হয় ঐ আদর্শের

চালুনী দিয়ে। আমরা যদি ডিমোক্রাসিকে শাসন-প্রণালী হিসেবেই ধরি তাহলে দুইটি প্রশ্নের উত্তর আমাদের দিতে হবে। প্রথমত ডিমোক্রাসি আমাদের সামাজিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খায় কি না? দ্বিতীয়ত আমাদের ভিক্ষা-পত্রের দফাগুলির সঙ্গে ডিমোক্রাসির ষোল আনা মিল আছে কি না?

(৪)

স্বরাজের কোন জীবন্ত ধারা বর্ত্তমান না থাকলেও স্বায়ত্ত-শাসন আমাদের দেশে নতুন নয়। তারপর এই যুদ্ধের কৃপায়, ইংরাজ-শাসন এবং শিক্ষার ফলে, পৃথিবীর রাজকীয় সমস্যার সঙ্গে আমরা এত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত হয়ে পড়েছি যে আমাদের চলতে গেলেই বিশ্বমানবের সাথে এক পথেই সমান পা-ফেলে হাঁটতে হবে, অতএব প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে "হাঁ, ডিমোক্রাসি আমাদের চাই"। কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্ন নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক্।

সাধারণ-তন্ত্র যে জনসাধারণের এত প্রিয় হয়ে উঠেছে, তার কারণ এই যে পূর্ব্বতন শাসন-প্রণালীর ভিত্তি অপেক্ষা এর ভিত্তি ঢের বেশি পাকা। পুরাকালে রাজ্যের ভিত্তি ছিল রাজার গুণ, এখনকার ভিত্তি লোকের সংখ্যা। রাজ্যতন্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করলে বোঝা যায় যে, এক Federation ছাড়া Aristotle এ বিষয়ে যে তত্ত্ব নিরূপণ করে গেছেন তা সনাতন। তাঁর মতে প্রথমে থাকে একের রাজত্ব, সেই এক রাজা যখন স্বার্থ-সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে প্রজার হিত-সাধনে কুণ্ঠিত হন, তখন তাঁর সভাস্থ সম্ভ্রান্ত পাত্রমিত্রের দল নিজেদের হাতে রাজ্য-শাসনের ভার গ্রহণ করেন তখন হয় অনেকের প্রভুত্ব। সেই বহু আবার যখন এক

গোষ্ঠীতে আবদ্ধ হয়ে গণ-হিত ভুলে গিয়ে নিজেদের প্রভুত্ব রক্ষণে তৎপর হয়ে ওঠেন তখন একজন শক্তিশালী পুরুষ জনসাধারণের সাহায্য নিয়ে নিজে tyrant হয়ে বসেন। তাঁরও পরোপকার বৃত্তি যখন বংশ পরম্পরার কাছে হার মানে তখন জন-সাধারণ তাদের লুপ্ত ক্ষমতার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে কুণ্ঠা বোধ করে না। কিন্তু কিছুকাল পরেই যখন দেখা যায় যে সাধারণের বুদ্ধি কোন অ-সাধারণ সমস্যার সুচারু-রূপে সমাধান করতে পারে না, তখন একজন মুল-গায়েন এই গোলে-হরিবোল থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ান বীরগর্ব্বে। আবার একের প্রভুত্ব সুরু হয়। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে বীরের আসর নেই, মুল-গায়েন আর বংশ-পরম্পরায় অবতীর্ণ হতে পারেন না। তাই সভ্যজগৎ আজকাল বহুর উপর আস্থা স্থাপন করেই নিশ্চিন্ত হয়েছে। তবে রাজ্য-শাসনের জন্য বিশেষ দরকার বলে কাজের ভার একদল বিশেষজ্ঞের উপর ন্যস্ত হয়েছে যারা সাধারণের কাছে নিজেদের কার্য্যাবলীর জন্য জবাব-দিহি করতে বাধ্য। এরি নাম গণ-তন্ত্র।

(৫)

অতঃপর দাঁড়াল এই যে ডিমোক্রাসি একটি শাসন প্রণালী ব্যতীত আর কিছুই নয়।

এ ব্যাপার সংখ্যামূলক। জন-সাধারণের ভিতর অবশ্য ভাল মন্দ সব প্রকৃতিরই লোক আছে, তবুও সাধারণ লোকের বুদ্ধির সমষ্টি জনকয়েকের অসাধারণ বুদ্ধির অপেক্ষা এ ক্ষেত্রে বেশি বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু যেকালে রাজনীতিতে বিশেষজ্ঞের আবশ্যক আছে তখন তাদের

পরিচয় জন্মের দলিলের বদলে কর্ম্মের দলিল হতেই নেওয়া শ্রেয়। এদের কার্য্যকারিতার বিচারক হবে অবশ্য জন-সাধারণ।

প্রথমেই প্রশ্ন উঠতে পারে, এই শাসন-প্রণালীর উদ্দেশ্য কি অন্য শাসন-প্রণালীর উদ্দেশ্য হতে বিভিন্ন? সকলেরই উদ্দেশ্য ত প্রজার মঙ্গল। তবে মঙ্গল কথাটার মানে এক্ষেত্রে একটু স্বতন্ত্র। আগে ছিল যাঁদের হাতে রাজ্য-শাসনের ভার তাঁরা যখন বেশি বোঝেন তখন তাঁদের মতে যা মঙ্গল তাই মঙ্গল। এখন এর মানে হচ্ছে প্রজার নিজের মতে যা মঙ্গল তাই মঙ্গল। য়ুরোপে যেদিন থেকে পোপ আর জার্ম্মাণ-সম্রাটের ঝগড়া বাধল সেই দিন থেকেই লোক-বাসুকী মাথা নাড়া দিয়ে নিজের সজীবতার পরিচয় দিলে—কুলীন-তন্ত্রের আসন টল্‌ল। Humanism-এর শিক্ষা যখন Erasmus, Colet, Abelard প্রভৃতি দেশময় ছড়িয়ে দিলেন, যখন renaissance-এর প্রসাদে মানুষের আত্মপূজার আরতি বেজে উঠল, যখন Martin Luther ধর্ম্মক্ষেত্রে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করলেন, অবশেষে যখন বিজ্ঞানের শিক্ষা লোকায়ত্ত হল তখন মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখলে। এই শুভ মুহূর্ত্তে ফরাসী-বিপ্লবের বীজ অঙ্কুরিত হল—সেই বিপ্লবের তন্ত্রধারকেরা দেখিয়ে দিলেন যে এক গণ-তন্ত্রেই মানুষ ব্যক্তিগত হিসাবে নিজের আনন্দে নিজের প্রকৃতির সব কলিগুলো ফোটাতে পারে, যা পূর্ব্ব-শাসনতন্ত্রে একেবারে অসম্ভব ছিল।

কিন্তু গোষ্ঠী-ধর্ম্ম পুরাতন বলেই যে বাতিল হয়ে গেল তা নয়। তাই নতুন অবস্থায় পড়ে গোষ্ঠী-ভাব জাতীয়-ভাবে পরিণত হল। Idea of Democracy রাজ্যতন্ত্রে রূপান্তর ঘটালে। কিন্তু রূপান্তরিত জাতীয়-ভাবের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সামঞ্জস্য হল একটি

ভূতপূর্ব্ব উপায়ে। চিরকালই রাজা তাঁর সভাসদ আমীর-ওমরাওদের পরামর্শ নিয়ে কাজ করতেন—কিন্তু বেশির ভাগ সময়ে শুধু বিপদ্‌কালেল্যুপস্থিতে। সম্ভ্রান্তবৃন্দের পক্ষে রাজার প্রসাদ প্রজা-হিতের চেয়ে বেশি ফলদায়ী, তাই তাঁদের দ্বারা জাতির যা মঙ্গল-সাধন হত তা কেবল পেটের দায়ে। ইউরোপের কোন কোন রাজ্যে একটি ব্যবস্থাপক সভা ছিল যেখানে রাজার আত্মীয় স্বজন পার্শ্বচর অনুচরবর্গ ছাড়া একটি জমিদারের দল, একটি পুরোহিতের দল এবং রাজ-কর্ম্মচারী দ্বারা নির্ব্বাচিত সাধারণ-দলের প্রতিনিধিরা আহূত হতেন রাজাকে সৎ পরামর্শ দেবার জন্য। ইংলণ্ডে প্রথম তিন দল একত্র হয়ে এক সভায় সেই দিন থেকে বসতে আরম্ভ করলেন যেদিন John-এর দুর্ব্বুদ্ধিতার ফলে ইংলণ্ডের সঙ্গে Normandy-র যোগ-সূত্র ছিন্ন হল। আর সাধারণ দল বসলেন অন্যত্র কিন্তু দুই দলের মধ্যে একটা যোগাযোগ রইল। ইংলণ্ডে এইরূপে এক জাতীয়তা এবং সেই জাতীয়তার মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর সামঞ্জস্য রক্ষা হল। ফরাসী দেশে তিন দল আলাদা represented হত। কিন্তু চতুর্দ্দশ লুই এবং পঞ্চদশ লুই এই সভার উপদেশ উপেক্ষা করে নিজেরাই শাসন কার্য্য সমাধা করতেন। কিন্তু ষোড়শ লুইএর রাজকোষ শূন্য হলে তিনি আবার এই ব্যবস্থাপক সভা ডাকতে বাধ্য হলেন প্রজার কাছ থেকে পয়সা আদায় করবার জন্য। প্রশ্ন উঠল এই যে, তিন দল আলাদা আলাদা না একত্রে ভোট্ দেবে। রাজার মৎলব আলাদা, প্রজার মৎলব একত্রে, ফলে ঘটল ফরাসী-বিপ্লব। সেই বিপ্লবে জমিদারের দল কেউ বা দেশ ছেড়ে চলে গেলেন, কেউ বা বাণিজ্যে মন দিলেন। সেই থেকে Separate representation of class-interests-এর পরমায়ু শেষ হল। বর্ত্তমান কালে

ইটালীর রাষ্ট্রীয় জীবনের ধারা ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের নকল বল্লে অত্যুক্তি হয় না।

১৮৫০ সাল থেকে প্রুসিয়া, সেক্সনি এবং অন্যান্য জার্ম্মাণ Municipality-তে ভোটারগণ তাদের টেক্স দেবার ক্ষমতা অনুসারে তিন ভাগে বিভক্ত হত। অষ্ট্রিয়াতে কিছুদিন আগে পর্য্যন্তও লোক সমাজকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হত—জমিদার, সহরবাসী ব্যবসায়ী, গ্রাম-সঙ্ঘ এবং জন-সাধারণ। হাঙ্গ্রি দেশে Table of magnates-এ শুধু বড় লোকেরাই বসতে পেতেন। কিন্তু গত যুদ্ধের ধাক্কায় এই রাজ্যগুলো ধূলিসাৎ হয়েছে, নতুন শাসন-প্রণালী যা অবলম্বিত হল তার বিশেষত্ব এই যে সমগ্র জাতিই হচ্ছে একটি সম্প্রদায়। বীরবলের মতে গত যুদ্ধে ব্যক্তি-তন্ত্রের অগ্নি পরীক্ষা হয়েছে এবং তিনি ১৯১৪ সালে যে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন তা ফলেছে। ডিমোক্রাটিক জাতিরাই জয়যুক্ত হয়েছে, আর পরাজিত জাতিরা ডিমোক্রাসি অবলম্বন করেছে। তাঁর কথা যেকালে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে তখন তাঁরই মতানুসারে যে সব জাতির জীবন ব্যক্তি-তন্ত্রের উপর গঠিত তাদের ইতিহাস হতে রাজনীতির মূলতত্ত্বের সন্ধান নেওয়া উচিত —বিশেষত যখন বাকী য়ুরোপের জীবন তাদেরই ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। তাহলে দেখা গেল যে, কি ইংলণ্ড কি ফ্রান্স কি ইটালী এমন কি জার্ম্মাণী, অষ্ট্রিয়াতেও (রুশিয়ার কথা ছেড়ে দিয়ে) যেকালে এ রকম ঘরের ভিতর ঘর সৃষ্টি করা বোকামীর পরিচয় এবং জাতীয়তার সর্ব্বনাশ-সাধক বলে পরিগণিত হয়েছে তখন বর্ত্তমান-ভারতে স্বায়ত্তশাসনের সূত্রপাতেই আমরা যে নির্ব্বিবাদে Communal representation-এর পক্ষপাতী হয়ে পড়েছি এই

প্রমাণ যে আমাদের মনে আজও দেশাত্মবোধের ঘোরতর অভাব রয়েছে। আমাদের দেশ-নায়কেরা দু'দলে একমত হয়ে আজ যে বিষবৃক্ষ রোপণ করলেন তাঁদের উত্তরাধিকারীদের তার মারাত্মক ফল ভোগ করতে অবশ্যই হবে।

(৬)

তাহলে আমাদের এখন কি কর্ত্তব্য? ভাগ্যক্রমে ভোটের ব্যবস্থা স্থির করে প্রাদেশিক লাট-সাহেবদের মত নিয়ে নতুন ধরণে সভা বসাতে এখনও এক বৎসর। ইতিমধ্যে দেশের দলপতিরা এই সত্য প্রচার করুন যে, মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে য়ুরোপ যখন Separate Communal representation জাতীয় ঐক্যের বিরোধী বলে ছেড়ে দিয়েছে তখন আমাদের দেশে য়ুরোপ এবং আমেরিকা যে-উপায়ে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে স্বদেশীয়তা রক্ষা করেছে সেই উপায়ই অবলম্বন করা সঙ্গত। য়ুরোপের সত্য আমাদের দেশে খাটবে বিশেষত যখন দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্যবশতই হোক য়ুরোপের রাজনৈতিক শিক্ষাগুরু ইংলণ্ডের শিষ্য হয়েই আমরাও রাজনীতির শিক্ষানবিশী করছি।

রাজনীতির ক্ষেত্রে জাতির তিনটি বিভাগ আছে। প্রথমত যারা ভোট দেবে তারা এক দল। দ্বিতীয়ত যারা ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য চালাবে তারা আর এক দল এবং যারা ভারী-দলের আনুকূল্যে সাধারণের মত লক্ষ্য করে রাজ্য-শাসন করবেন অর্থাৎ Executive, তাঁরা হচ্ছেন তৃতীয় দল। কে কি রকম ভাবে ভোট দেবে, কি রকম ভাবে ব্যবস্থাপক সভা গড়া হচ্ছে এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে ব্যবস্থাপক

সভার সম্বন্ধ কি হবে এই তিন বিষয়ের তথ্যের উপর আমাদের ভবিষ্যৎ programme নিয়মিত এবং নিরূপিত হওয়া কর্ত্তব্য।

প্রথমেই ভোটের কথা ধরা যাক। ভোট দেবার অধিকার সম্পত্তি-মূলক কিম্বা মনুষ্যত্ব-মূলক, যে মূলকই হোক না ভোট দেবার রীতি সাধারণত দুই রকমের। প্রথমত প্রত্যেক জেলায় প্রতিনিধি স্থানীয় ভোটের দ্বারাই নির্ব্বাচিত হবে—একেই বলে Scrutin d' arron dissement, ভাষান্তরে district system. দ্বিতীয়, প্রতিনিধি ঠিক করা হবে একটা সমগ্র প্রদেশের ভোট একত্র নিয়ে, এই প্রদেশের ভিতর অবশ্য অনেক জেলা আছে। যদি দশ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের কথা হয়, তাহলে প্রত্যেক ভোটারের হাতে একটা লিষ্ট থাকবে সেই লিষ্টে অন্তত দশ জনের নাম থাকবে, ভোটার তখন বিচার করে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি ক্রমে গুণানুসারে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে দেবে। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বেশি সংখ্যা ভোট পাবেন তিনিই প্রথমে নির্ব্বাচিত হবেন এই রকমে পর পর দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি। একে বলে Scrutin de liste, ভাষান্তরে General ticket system. এই দু'পদ্ধতিরই দোষ-গুণ আছে এবং দুই পক্ষেই বড় বড় কৌন্সিলী দাঁড়িয়েছেন। ফরাসী দেশে Montesquieu, Mirabeau থেকে আরম্ভ করে Duguit পর্য্যন্ত; ইংলণ্ডে Lord Brougham থেকে Sidgwick, Balfour; জার্ম্মাণীতে Bluntschli—এঁরা সকলেই বলেন যে জাতীয়-জীবনের সমস্ত প্রবাহগুলির অবাধ গতির পক্ষে district system ভাল, আবার Robespierre থেকে M. Goblet পর্য্যন্ত সকলেই Scrutin de liste-এর পক্ষপাতী। দু'দলেই যখন মহা মহারথী রয়েছেন তখন

নিজেরাই আলোচনা করে দেখা যাক আমাদের পক্ষে কোন্‌টি ভাল। District method-এর বিপক্ষে এই যুক্তি পেশ করা হয়েছে যে, প্রথমত নির্ব্বাচনের গণ্ডী ছোট হলে অনেক সময় অযোগ্য লোককে ভোট দিতে হয়। দেখা গেছে যে, যে-সব সহরে ward অনুসারে alderman বাছাই হয় সেখানে ঘুষের জোরে যোগ্যতা থই পায় না।

দ্বিতীয়ত এই সব অযোগ্য লোকেরা নিজেদের ছোট গণ্ডীর অতিরিক্ত কোন জাতীয় ভাবের ধারণা মনে পোষণ করতে অপারগ। ফ্রান্স এবং ইটালীর ইতিহাসে এই সত্যের ভূরি ভূরি প্রমাণ রয়েছে—ইটালী বুঝে সুঝে district method ছেড়ে দিয়েছে। এই রীতিতে যে-সব Deputy পাঠান হয় তাঁরা নিজেদের কেবলমাত্র জেলার প্রতিনিধি হিসেবেই দেখেন, সমগ্র দেশেরও যে তাঁরা প্রতিনিধি এ কথা তাঁরা মনে ভাবতেই পারেন না—সেইজন্য তাঁরা নিজের ভোটারদের খুসী করতে এত ব্যস্ত থাকেন যে দেশের রাজকার্য্য চালাবার কথা তাঁদের মনে থাকে না। Daudet তাঁর Numa Roumestan বইয়ে এঁদের দুর্দ্দশার কথা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করেছেন—কোথায় একটা বাজার বসাতে হবে, কোথায় কার ছেলের চাকরী করে দিতে হবে এই সব কাজ করতে করতে তিনি ভোটারদের বাজার-সরকারে পরিণত হন। District system-এ যে পরিমাণে তোষামুদী এবং ঘুষের প্রশ্রয় পায় তার তুলনা কুত্রাপি নেই।

তৃতীয়ত এই উপায়ে শাসকের দল ভোট অনুসারে যে স্থানের যত সংখ্যক প্রতিনিধি হওয়া উচিত তা অপেক্ষা নিজেদের মনোমত বেশি সংখ্যক প্রতিনিধি হস্তগত করবার জন্য জেলাকে খেয়াল অনুসারে বিভাগ করেন।

এসব গেল বিপক্ষের কথা। স্বপক্ষের কথা হচ্ছে district system-য়ে প্রথমত ভোট দেওয়া সহজ হয়, প্রতিনিধি ভোটারদের পরিচিতেরমধ্যে একজন এবং সেই পরিচয়ের জোরেই তিনি জেলার অভাব দূরীকরণে বেশি তৎপর থাকেন। দ্বিতীয়ত এ উপায়ে যাঁদের দল সংখ্যায় কম তাঁদের মতেরও যথাযোগ্য মূল্য দেওয়া হয়। সাধারণ-তন্ত্রের দোষই এই যে মতের গুরুত্ব অনুসারে দলের ভারীত্ব নির্দ্ধারিত হয় না। General ticket system অনুসারে যে-কোনও দল চালাকী করে সব প্রতিনিধিগুলিকেই হস্তগত করতে পারেন—সেইজন্য আমেরিকা ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এই পদ্ধতি ত্যাগ করে district method গ্রহণ করেছেন। চতুর্থত Bradford সাহেবের মতে যে-কালে অশিক্ষিত ভোটারের পক্ষে সূক্ষ্মভাবে ভোটপ্রার্থীদের গুণ বিচার করে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা অসম্ভব, জনসাধারণকে সেকালে party-guide-এর হাতে পড়তেই হবে; অতএব স্বাবলম্বনই শ্রেয়।

মোটামুটি এইত গেল যুক্তির কথা, দৃষ্টান্তের কথা তারপর। ফ্রান্স ১৭৯১ সালে Scrutin d' liste আরম্ভ করেন, ফলে দেশের তিন দল একমত হয়ে রাজার অত্যাচারের বিপক্ষে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল, তারপর নেপোলিয়নের যুগে সব ওলট-পালট হয়ে গেল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তৃতীয় নেপোলিয়ন আবার এই ভোটের কৃপায় ফ্রান্সের সম্রাট হয়ে বসলেন কিন্তু তাঁর কার্য্যকলাপ দেখে ফ্রান্স মনস্থির করলে যে Dictator-এর যুগ চলে গেছে, তাই ১৮৭৬ সাল থেকে রাজবংশের পুনরাগমন বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে Scrutin d' arrondissement পুনঃপ্রতিষ্ঠ হল। কিন্তু শীঘ্রই দেখা গেল যে ফ্রান্সের ব্যবস্থাপক সভায় কি দেশাত্ম-

জ্ঞান, কি ধর্ম্ম-জ্ঞান সবই লোপ পাচ্ছে, তাই ছোট দলগুলিকে এক করে একটি স্থায়ী Republican দল গড়বার প্রয়াসে Scrutin d' liste-এর আশ্রয় পুনরায় গ্রহণ করা হল। কিন্তু Boulanger আবার যখন নূতন নেপোলিয়ন হতে চাইলেন তখন ১৮৮৯ সালে district method ফিরে এল। ফলে ফরাসী দেশের ব্যবস্থাপক সভার দুর্দ্দশার কথা সকলেই অবগত, বিস্তর ছোট দলের উপদ্রবে বড় দলের স্থায়ীত্ব নেই, মন্ত্রীদলের পরমায়ু গড়পরতা ৮॥০ মাস এবং কোন কার্য্যেই তাঁরা নিজেদের দলের উপর নির্ভর করতে পারেন না—ব্যবস্থাপক সভা সে দেশে হয়ে উঠেছে একটা Debating club. ফ্রান্স নিজের দুরবস্থার কথা বোঝে কিন্তু পাছে আবার কেউ ভোটারদের ঠকিয়ে নেপোলিয়ন হয়ে বসে এই ভয় তার এখনও ঘোচে নি—শুধু তাই নয় ফ্রান্স বহুকাল থেকেই সুস্পষ্টভাবে জেলায় জেলায় বিভক্ত এবং জেলার শাসন-প্রণালী রাজ্যে সাধারণ-তন্ত্র থাকা সত্ত্বেও অতিশয় centralised. তার উপর সে দেশে আছে—ল্যাটিন বুদ্ধির চিরন্তন symmetry-প্রিয়তা, এই সব কারণে এখনও ফ্রান্স district method-কে আঁকড়ে ধরে থাকতে বাধ্য। বর্ত্তমান কালে এক ফ্রান্স, ইংলণ্ড এবং আমেরিকা ছাড়া ইটালী, বেলজিয়ম, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, পর্টুগাল, স্পেন, কোবে, জাপান, অনেক Swiss Cantons, আইসল্যাণ্ড, টেস্‌মেনিয়া, কুইন্সল্যাণ্ড ব্যতীত সমগ্র অষ্ট্রেলিয়া এই Scrutin d' liste মেনে নিয়েছে। সাধারণ-তন্ত্রের অনিবার্য্য দোষ এই যে যে-সম্প্রদায় সংখ্যায় কম সে-সম্প্রদায় নিজের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করতে পারেন না। কিন্তু General ticket system অবলম্বন করার জন্য পূর্ব্বোক্ত সব দেশেই তাঁদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

এখন যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দুই-ই দেখান গেল। আমার কথা এই যে district system-এর যে দোষগুলি য়ুরোপে দেশাত্মবোধ অত সুগভীর থাকা সত্ত্বেও প্রকট হয়েছে—যথা ছোট ছোট দলের মধ্যে জাতীয়তার অভাব, গণ্ডীর বাইরে যাবার অক্ষমতা—এগুলি ত ভারতবর্ষের সনাতন দোষ—তার উপর য়ুরোপ আমেরিকা যা পরিত্যাগ করেছে অর্থাৎ—communal representation, তাই আমরা যেচে নিলুম। কাজেই আমার মতে আমাদের general ticket system অবলম্বন করলে খানিকটা বাঁচাও, নচেৎ আমাদের ব্যবস্থাপক সভা একটা দলাদলীর আড্ডা হবে।

শ্রীধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।